

হজ দর্শন ও বিধান

হজ গাইড

pdf By Syed Mostafa Sakib



শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

فلسفہ
হজু দর্শন ও বিধান

মূল
শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ ও সম্পাদনা
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সন্জয়ী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছেট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিলম্বা, চট্টগ্রাম-৮০০০

ହଜ୍ଜ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଧାନ

ମୁଲ୍ୟ : ୨୦୦ [ଦୁଇଶତ] ଟାକା ମାତ୍ର

ହଜ୍ଜ ଦର୍ଶନ ଓ ବିଧାନ

ମୂଳ : ଶାଇଖୁଲ ଇସଲାମ ଡ. ମୁହମ୍ମଦ ତାହେର ଆଲ-କାଦେରୀ

ଅନୁବାଦ ଓ ସମ୍ପାଦନା :

ଆବୁ ଆହମଦ ଜାମେଉଲ ଆଖତାର ଚୌଧୁରୀ

ପ୍ରକାଶକ :

ମୁହମ୍ମଦ ଆବୁ ତୈୟବ ଚୌଧୁରୀ,

ପ୍ରକାଶକାଳ :

୫ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୧୨ ଇଂ, ୧୨ ରବିଓଲ ଆଉୟାଲ ୧୪୩୩ ହିଃ, ୨୩ ମାଘ ୧୪୧୮ ବାଂଲା

© ସନ୍ଜରୀ ପାବଲିକେଶନେର ପକ୍ଷେ ନୁ଱େ ଜାନ୍ମାତ ତୃଷ୍ଣା

ପରିବେଶନାୟ :

ସନ୍ଜରୀ ବୁକ ଡିପୁ

୮୧, ଶାହୀ ଜାମେ ମସଜିଦ ମାର୍କେଟ, ଆନ୍ଦରକିଲ୍ଲା, ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ, ମୋବାଇଲ : ୦୧୬୧୩-୧୬୦୧୧

ପ୍ରକାଶନାୟ :

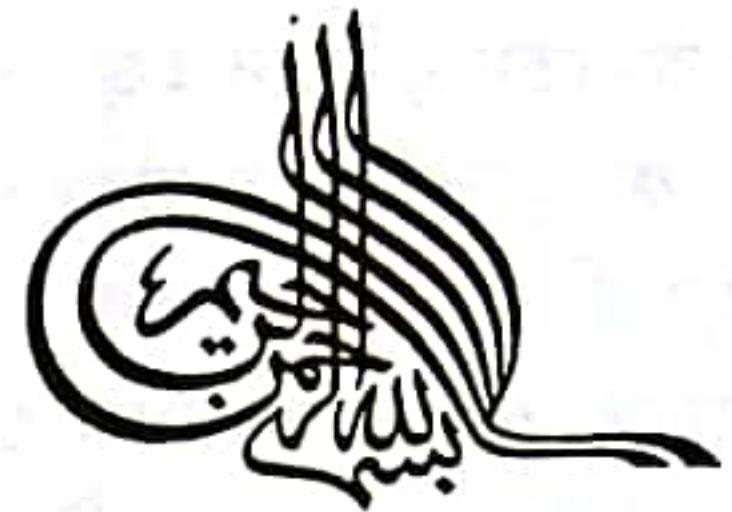
ସନ୍ଜରୀ ପାବଲିକେଶନ

୪୨/୨ ଆଜିଯପୁର ଛୋଟ ଦାୟରା ଶରୀଫ, ଢାକା- ୧୨୦୫, ମୋବାଇଲ : ୦୧୯୨୫-୧୩୨୦୩୧

୮୧, ଶାହୀ ଜାମେ ମସଜିଦ ମାର୍କେଟ, ଆନ୍ଦରକିଲ୍ଲା, ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ, ମୋବାଇଲ : ୦୧୬୧୩-୧୬୦୧୧

ମୂଲ୍ୟ : ୨୦୦ [ଦୁଇଶତ] ଟାକା ମାତ୍ର

Hajj Dorshon O Bidan, By: Dr. Taher Al-Qaderi, Translated & Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 200/-



مَوْلَايَ صَلَّ وَسَلَّمَ دَائِيًّا أَبَدًا

عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلَّهُمْ

وَالآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ

أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَالنُّقُّىٰ وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ

﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

সূচিক্রম

পূর্বকথা

প্রকাশকের কথা

ইসলামের পঞ্চম বুনিয়াদের অন্যতম বুনিয়াদ হজু। কা'বা শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঁই, 'আরাফা-মুয়্দালিফায় অবস্থান এবং মীনায় শয়তানকে কক্ষ নিক্ষেপ ও কুরবানী ইত্যাদির সমষ্টিকে বলা হয় হজু। কিন্তু হজুর মূল তাৎপর্য ও দর্শন নিহীত রয়েছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবনের উপর। হজু হচ্ছে প্রভু প্রেমের কাব্যগাঁথা। হজুর প্রতিটি রূক্ষণ ও আহকাম মহান রবের প্রেমে আত্মারা কোন প্রেমিক বান্দর পথরেখার সন্ধান ছাড়া কিছুই নয়। তাই হজুর আসল স্বাদ গ্রহণ করতে হলে ওই ঐতিহাসিক বাস্তবতাগুলো জানা আবশ্যিক বলে মনে করি।

শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী আলোচ্য পুস্তকে হজু, উমরা ও জিয়ারতের আহকাম এবং আদব আলোচনার পাশাপাশি হজুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব, তাৎপর্য ও দর্শন অত্যন্ত চমৎকার ভাষায় বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছেন। যা হজু ও জিয়ারতে গমনোচ্ছুক ব্যক্তি ছাড়াও হজুর প্রকৃত দর্শন জানতে প্রত্যেক পাঠকের জন্য উপকারী।

সন্জরী পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমানগণের জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট উপহার। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে অবৃত সাজাদ-ই শোকর আদায় করছি। পাঠকমহলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ রইলো কোন প্রকার ভুল-ক্রটি দৃষ্টি গোচর হলে অবহিত করে আমাদের সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবূল করুক। আমিন!

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্জরী পাবলিকেশন

প্রথম অধ্যায়	১
হজু : মহৱতের প্রকাশকেন্দ্র	৩
মানব-প্রকৃতি ও প্রেম	৩
প্রেমের বহিঃপ্রকাশ কুরআনের দৃষ্টিতে	৫
জাগতিক ভালোবাসার সঙ্গে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৱতের তুলনা:	৫
মহৱতের অগ্রযাত্রা : রূপক থেকে বাস্তবতার দিকে	৬
মু'মিন বান্দা এবং দার্শনিকের বন্ধনে পার্থক্য	৭
ঈমানদার বান্দা ও ইশ্ক-মুহৱতের কারিশমা	৮
মুহৱতে অদম্যতার প্রকাশ	৯
প্রেমের দাবির পূর্ণতাসাধন ও প্রশান্তির উপায় একমাত্র হজু	১০
মানাসিকে হজু : ইশ্ক ও মুহৱতের দর্পণ	১১
অদম্য ইশ্ক ও মহৱতের দৃশ্য	১২
শাআয়িরল্লাহৰ সম্মান ও হজু	১৪
ইবাদাত ও আদবে পার্থক্য	১৪
ইবরাহিমী পরীক্ষার ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলি	১৫
প্রথম পরীক্ষা	১৫
দ্বিতীয় পরীক্ষা	১৫
তৃতীয় পরীক্ষা	১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	২০
হজুর ঐতিহাসিক পটভূমি	২১
মক্কা ভূমির মহত্ত্বের কারণ	২২
কা'বা : দাওয়াত ও তাবলীগের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র	২২
ইবরাহিমী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা	২৪
বর্তমান মানব ইতিহাস ও হজু	২৪
হজুর ইতিহাসের সূচনা	২৪
হজুর (ইবরাহিমী) 'মানাসিক'-এ বিকৃতিসাদন	২৫
হজু ও জাহিলি যুগের শ্রেণীবিভেদ	২৮

গোত্রীয় অহংকার ও আত্মভূরিতার বিলুপ্তি	২৮	পঞ্চম অধ্যায়	
হজু থেকে নগনতা, অশ্লীলতা ও কুপ্রথা বিনাশের ঘোষণা	২৯	হজুর পরিভাষা ও স্থানসমূহ	৫৫
বিদায় হজুর খুতবার গুরুত্ব ও অনন্যতা	৩০	হজুর পরিভাষাবলি	৫৫
তৃতীয় অধ্যায়		হজু	৫৫
হজুর হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কেন্দ্রীয় ভূমিকা	৩৩	ওমরা	৫৫
কেন?		মী'কাত	৫৫
প্রথম কারণ	৩৩	হিল্ল	৫৫
দ্বিতীয় কারণ	৩৪	হারামে কা'বা	৫৫
তৃতীয় কারণ	৩৪	আহলে হিল	৫৫
চতুর্থ কারণ	৩৬	আহলে হারাম	৫৫
তাওয়াহীদী দৃষ্টিভঙ্গিই ঐক্যের ভিত্তি	৩৮	আফাকী	৫৫
চতুর্থ অধ্যায়		ইয়াওমুত্তারবিয়া	৫৬
হজুর মানাসিকের তাৎপর্য	৩৯	আরাফার দিন	৫৬
শাআয়িরুল্লাহ (আল্লাহর নির্দর্শনাবলি) কী?	৩৯	ইয়াওমে নাহার	৫৬
শাআয়িরুল্লাহ ও ইশ্কের দাবি	৪০	আইয়ামে তাশরীক	৫৬
হজু সম্পর্কে কুরআনি নির্দেশনা	৪০	ইহরাম	৫৬
নবী-মুস্তফার সামনে বিবেককে নতজানু কর	৪২	তালবিয়া	৫৬
হজুর পালনীয় কাজসমূহ (মানাসিক) এবং এগুলোর তাৎপর্য	৪৩	ইয়ত্বেবা'	৫৭
মকাবূমির মহত্তম মর্যাদার কারণ	৪৫	ইসতিলাম	৫৭
'ভাগ্যবান সে নগরী যেখানে আছে মোর প্রেমাস্পদ'	৪৬	রামাল	৫৭
কুরআন মাজীদে বায়তুল মাক্দিসের সপ্রশংস আলোচনা	৪৭	তাওয়াফ	৫৭
ফরয নামাযের সঙ্গে আব্সিয়া-ই কিরামের সম্পর্ক	৪৭	তাওয়াফে কুদূম	৫৭
আল্লাহর প্রিয়দের বাধ্যতামূলক কাজকর্ম মানাসিকে হজুর মূলভিত্তি হয়ে	৪৮	তাওয়াফে যিয়ারত	৫৭
গেলো		তাওয়াফে বিদা	৫৭
মহান যবাইয়ের স্মৃতি	৪৯	তাওয়াফে ওমরা	৫৭
হজুর মানাসিকসমূহ, হ্যরত খলীল ও খলীলতনয় (আ.)-এর	৪৯	সাঁঈ	৫৭
স্মারক		ওকুফে আরাফা	৫৭
তাওয়াফে সদল্পে চলার ভঙ্গি	৫১	রমী	৫৭
মাকামে ইবরাহীমকে নামাযস্ত্রল করার কারণ	৫১	হাদী	৫৭
সাফা মারওয়ার সাঁঈ (দৌড়)	৫২	হলক	৫৭
কুরবানীর পশ্চও শা'আইরুল্লাহ (নির্দর্শন)	৫৩	তাকসীর (কসর করা)	৫৭
শেষ কথা	৫৪	হজুর স্থানসমূহ	৫৮

কা'বা মুশাররাফা	৫৮	জিমার	৬০
রূকন	৫৮	ষষ্ঠ অধ্যায়	
হাজরে আসওয়াদ	৫৮	ওমরার পালনীয় কাজসমূহ	৬২
মুলতাফিম	৫৮	হজু ও যিয়ারাতের সফরের 'আদাব' (নীতি ও শিষ্টাচার)	৬২
মীয়াবে রহমত	৫৮	ওমরার ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ	৬৩
হাতীম	৫৮	মীকাত	৬৩
মুস্তাজার	৫৯	ইহরাম-এর পদ্ধতি	৬৩
মুস্তাজাব	৫৯	ইহরাম-এর নিয়ত	৬৩
মাকামে ইবরাহীম	৫৯	ওমরার নিয়ত	৬৪
যমযম শরীফের গম্বুজ	৫৯	তালবিয়া	৬৪
বাবুস সাফা	৫৯	মকা মুকাররমায় প্রবেশের দোয়া	৬৫
বাবুস সালাম	৫৯	বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশকালীন দোয়া	৬৬
সাফা	৫৯	বায়তুল্লাহর দিকে প্রথম দৃষ্টি	৬৬
মারওয়াহ	৫৯	তাওয়াফ : ইয়তিবা'	৬৭
মীলায়নে আখ্যারাইন	৫৯	তাওয়াফের নিয়ত	৬৮
মাস'আ	৫৯	ইস্তিলাম	৬৮
তানঙ্গম (মাসজিদ-এ আয়েশা)	৬০	তাওয়াফে প্রতিটি রূকনের পৃথক পৃথক দোয়া	৬৯
যুল হুলায়ফা	৬০	তাওয়াফে রূকনে ইরাকীর দোয়া	৬৯
যাতে ইরক	৬০	তাওয়াফে রূকনে শামীর দোয়া	৬৯
জুহুফা	৬০	তাওয়াফে রূকনে ইয়ামানীর দোয়া	৭০
করন-আল মানাফিল	৬০	রূকনে ইয়ামানী হতে হাজর-এ আসওয়াদ পর্যন্তের দোয়া	৭০
আরাফাত	৬০	তাওয়াফে সাত চক্রের পৃথক পৃথক দোয়াসমূহ	৭১
মাওকিফ	৬০	প্রথম চক্রের দোয়া	৭১
বাতনে আরফা	৬০	দ্বিতীয় চক্রের দোয়া	৭২
মসজিদে নমিরা	৬০	তৃতীয় চক্রের দোয়া	৭৩
জাবালে রহমত	৬০	চতুর্থ চক্রের দোয়া	৭৩
মুয়দালিফা	৬০	পঞ্চম চক্রের দোয়া	৭৪
মায়নীন	৬০	ষষ্ঠ চক্রের দোয়া	৭৫
মাশ'আরে হারাম	৬০	সপ্তম চক্রের দোয়া	৭৬
ওয়াদী-এ মাহ্শার	৬০	মাকামে ইবরাহীমের দোয়া	৭৭
মিনা	৬০	মুলতাফিমের দোয়া	৭৯
মসজিদ-এ খায়ফ	৬০	যমযম পান করার দোয়া	৮০

সাঁজ		
সাঁজের নিয়ত	৮১	১০১
সাফা পর্বতে কিবলামুখী হয়ে এই দোয়া করুন	৮১	১০১
সাঁজে আরম্ভ করার দোয়া	৮২	১০২
সাফা ও মারওয়া হতে অবতরণের দোয়া	৮৪	১০২
মারওয়ার দিকে যাওয়ার সময় এই দোয়া করবেন	৮৪	১০৩
মীলাইনে আখ্যারাইন	৮৪	
সাফা-মারওয়ার চক্রের নির্দিষ্টতা	৮৫	১০৪
হলক বা কসর এবং ওমরার সম্পূর্ণকরণ	৮৬	১০৪
ইহরাম খুলে ফেলা	৮৬	১০৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা	৮৭	১০৫
সপ্তম অধ্যায়		
মানসিকে হজ্র (হজ্রের পালনীয় কাজসমূহ)	৮৮	১০৫
হজ্রের পাঁচদিন ব্যাপী প্রোগ্রামের ক্রমবিন্যাস	৮৮	১০৬
গোসল ও ইহরাম	৮৮	১০৭
হজের নিয়ত	৮৮	১০৮
তালবিয়া	৮৯	১০৮
তাওয়াফে কুদূম	৮৯	১০৯
মিনায় রওয়ানা	৮৯	১০৯
মিনায় পড়ার দোয়া	৮৯	১০৯
ইয়াওমে আরাফা (হজ্রের দ্বিতীয় দিবস ৯ জিলহজ্র)	৯০	১০৯
আরাফাতে প্রবেশ করার দোয়া	৯১	১১০
আরাফাতে অবস্থানের দোয়া	৯১	১১১
মুযদালিফায় যাত্রা ও রাত্রি যাপন	৯১	১১১
ইয়াওমে নাহর (হজ্রের তৃতীয় দিবস -১০ জিলহজ্র)	৯১	১১২
মুযদালিফায় অবস্থান	৯১	১১২
মিনার দিকে রওয়ানা	৯১	১১২
জামরায়ে আক্তাবা (জ্যেষ্ঠ শরতান) এর উপর প্রথম প্রস্তরনিক্ষেপ	৯১	১১২
কোরবানী	১০০	১১৩
হলক বা কসর	১০০	১১৩
ইহরাম খুলে ফেলা	১০০	১১৪
তাওয়াফে যিয়ারত	১০১	১১৫
হজ্রের সাঁজ		
রমীর দিনসমূহ (হজ্রের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠি দিবস- ১১, ১২, ১৩ জিলহজ্র)		১০১
তাওয়াফে বিদা		১০২
কা'বা শরীফ থেকে বিদায়ান্তের দোয়া		১০২
পরিবারকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দেওয়া		১০৩
অষ্টম অধ্যায়		
হজ্র ও ওমরার মাসায়িল		১০৪
হজ্রের বিবরণ		১০৪
হজ্রের প্রকারভেদ		১০৫
ইফরাদ		১০৫
ক্রিবান		১০৫
তামাত্র		১০৫
হজ্র ফরজ হওয়ার শর্তাবলি		১০৫
হজ্র আদায় করার শর্তাবলি		১০৬
আদায় সহীহ হওয়ার জন্যে শর্তাবলি		১০৭
হজ্রের ফরজসমূহ		১০৮
হজ্রের ওয়াজিবসমূহ		১০৮
তাওয়াফের কতিপয় জরুরি মাসায়িল		১১০
হজ্রের সুন্নাতসমূহ		১১১
জরুরী জ্ঞাতব্য		১১১
হজ্র ও ওমরার বিবিধ মাসায়িল		১১২
ইহরামে জোড়া-তালি লাগানো		১১২
মহিলাদের হজ্র		১১২
পিতামাতা ঝণগ্রস্ত হওয়ায় সন্তানের হজ্র বাদ যাবে না		১১২
শীতকালে ইহরামের উপর উষ্ণবন্ধ পরিধান করা		১১২
হজ্রে আসগার ও হজ্রে আকবার		১১৩
জুমার দিনে আরাফাতে ওকূফ করা		১১৩
বদলী হজ্র ও তার শর্তাবলি		১১৩
মৃতব্যক্রিয় পক্ষ থেকে বদলি হজ্র		১১৪
কোরবানীর মূল্য দান করা বা হারমের বাইরে কোরবানী দেওয়া জায়েয় নেই		১১৪
হারাম মালেঁ কৃত হজ্র কবৃল হয় না		১১৫
তাওয়াফ ও অন্যান্য আমলের সাওয়াব প্রতিটি মওসুমে হয়		১১৫

ভূল-অপরাধ ও তদীয় হৃকুম আহকাম	১১৬	মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করার দোয়া	১৩৪
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ	১১৬	মদীন মুনাওয়ারার যিয়ারতসমূহ	১৩৫
অপরাধ ও ভূলের বিধান	১১৭	মসজিদে নববীর ফর্যীলত	১৩৬
দম	১১৭	মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ	১৩৭
বুদনা	১১৯	মসজিদে নববীর দরোজা	১৩৮
সাদকা	১১৯	মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার দোয়া	১৩৮
দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কথা	১২০	রিয়াজুল জান্নাত	১৩৯
নবম অধ্যায়			
মক্কা নগরীর ফর্যীলত	১২১	মসজিদে নববীর পবিত্র স্তম্ভসমূহ	১৩৯
মক্কা নগরীর যিয়ারতসমূহ	১২৩	সুতুনে হান্দানাহ	১৪০
আবু কুবাইস পর্বত	১২৩	সুতুনে আয়েশা (রা.)	১৪০
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জন্মস্থান	১২৩	সুতুনে আবু লুবাবা	১৪০
বনু হাশেমের মহল্লা	১২৪	সুতুনে সারিন	১৪০
খাদীজাতুল কুবরা (রা.)'র ঘর	১২৪	সুতুনে হারস	১৪০
জান্নাতুল মু'আল্লা	১২৫	সুতুনে উফুদ	১৪১
হ্যরত আবু বকর ছিন্দীক (রা.)'র বাসগৃহ	১২৫	সুতুনে তাহাজুদ	১৪১
দারে আরকাম	১২৫	মেহরাব ও মিস্বার	১৪১
হেরা গুহা	১২৬	পবিত্র রওজা	১৪১
ছাওর গুহা	১২৬	সবুজ গম্বুজ	১৪২
মুরসালাত গুহা	১২৬	মুওয়াজাহা শরীফ ও মাকচুরাহ শরীফ	১৪২
জাবালে রহমত	১২৬	সুফ্ফাবাসীদের চতুর	১৪৩
নমিরাহ মসজিদ	১২৬	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিতি	১৪৩
মসজিদে মুযদালিফা	১২৭	মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে হাজির হয়ে	
মসজিদে খাইফ	১২৭	যা আরজ করবেন	১৪৫
মসজিদে আয়েশা	১২৭	সাইয়েদুনা ছিন্দীকে আকবর (রা.)'র খেদমতে যা আরজ করবেন	১৪৭
মসজিদে রায়া	১২৭	হ্যরত ওমর ফারুকে আয়ম (রা.)'র খেদমতে যা আরজ করবেন	১৪৮
মসজিদে জিন	১২৮	জান্নাতুল বাকী	১৫৩
দশম অধ্যায়			
মদীনা মুনাওয়ারার ফর্যীলত	১২৯	জান্নাতুল বাকীর দোয়া	১৫৪
মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র রওজা মোবারক	১৩০	মসজিদে কোবা	১৫৫
যিয়ারত- করার ফর্যীলত	১৩০	মসজিদে কেবলাতাইন	১৫৬
মদীনা মুনাওয়ারার সফর	১৩৩	মসজিদে জুমা	১৫৭
		মসজিদে গমামাহ	১৫৭
		মসজিদে ফাতাহ	১৫৮

উল্লদ ও শহীদানে উল্লদের যিয়ারত	১৫৮
পবিত্র মদীনার কুপসমূহ	১৬০
বিদায় হে প্রিয় নবীজীর প্রিয় শহর, তোমাকে বিদায়!	১৬০
বিদায়ী দোয়া	১৬১

প্রতিক্রিয়া

পূর্বকথা

হজু কী?

ইসলামের পাঁচটি মূল রূকনের মধ্যে হজু হল পঞ্চম। সাধারণের মাঝে এ কথা তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, হজু হল কা'বা শরীফের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সঙ্গে, মুক্কা শরীফের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিতি ইত্যাদি। কিন্তু যদি হজুর তাৎপর্যের ওপর গভীরভাবে চিন্তা করা যায়, তা হলে বোঝা যাবে, এটি হল ভালোবাসার বিশাল একটি উপন্যাস, যাকে মুসলমানরা প্রতিটি বছর নিজের একান্ত কর্তব্য মনে করে নির্দিষ্ট দিনে সুগভীর শৃঙ্খলা ও ভালোবাসা নিয়ে আদায় করে থাকে।

এমনিতেই ইসলামের প্রত্যেকটি রূকনের আদায় ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ভালোবাসার ওপর। উপরন্তু হজু সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, হজু সেই ভালোবাসারই শীর্ষবিন্দু অধিকার করে আছে।

আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনার পর প্রথম রূকন হল নামায। যার আলোকে বান্দা দিনে পাঁচবার মাহবুবের স্মরণে দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জিকিরে মশগুল হয়ে যায়। আর জাকাত হল মাহবুবের সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ খরচ করা। তেমনিভাবে রোজা হল আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য আহার-পানাহার ছেড়ে দেওয়ার নাম। কিন্তু একমাত্র হজুই হল আপাদমস্তক মুহার্বতের সফর। তার প্রতিটি রূকন মুহার্বতের বহিঃপ্রকাশ। হজুর মধ্যে মানুষ অহঙ্কার ছেড়ে, শোভা-সৌন্দর্যের পোশাক ছুড়ে শুধু দুটি সাদা কাপড় পরে আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত হয়ে যায়। বৈধ প্রবৃত্তি থেকেও যোজন দূরত্বে থেকে শুধুই আল্লাহর স্মরণে পাগলের মতো দৌড়ায়। কখনো পাথরে চুমু দেয়, কখনো কা'বার দেয়ালে চুমু খায়, কখনো সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ায়, কখনো একটু থামে আবার কখনো দোয়া করে। তেমনিভাবে মিনায় যাওয়া, আরাফা ও মুয়দালিফায় গমন এবং সেখানে জল্ল-কুরবানি ইত্যাদি কী? এগুলো হল মাহবুবের পথরেখা সন্ধান। মোটকথা প্রত্যেকটি আমলে আল্লাহর পিয়ারা বান্দারা হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, তাঁর বিবি হাজেরা আলাইহাস সালাম ও হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্মরণকে তাজা করে।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর বক্তৃতা সংকলন, যা হজু বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছিল। বয়ান যেহেতু ছিল পুরোপুরি

ভালোবাসার দর্পণ, সেহেতু শব্দের আঁচলে ভালোবাসার সবটুকু চাটনি ধরে রাখা
সম্ভব নয়। কারণ

مُجْتَمِعٌ وَالْفَاظُ مِنْ لَا يُنْهِيْ جَانِيْ حَقِيقَتٍ هِيَ وَهَذَا كَحَقِيقَتٍ جَانِيْ
☆

-ভালোবাসাকে শব্দে-বাকে ধারণ করা যায় না। সেটি এমন তত্ত্ব যা
অনুভব করা যায়, বোঝানো যায় না।

তারপরও যতটুকু সম্ভব বঙ্গার ইশক ও মুহার্বতের আবেগকে ধরে রাখার এবং
ভালোবাসার রঙকে সঠিকভাবে বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে বক্ষমাণ
গ্রন্থে।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে নিজের মুহর্বত দান করুন। আমীন॥

প্রথম অধ্যায়

হজু : মুহার্বতের প্রকাশকেন্দ্র

উল্লেখিত শিরোনামের আওতায় ইসলামের অন্যতম রঞ্জন হজুরের বিশেষ গুরুত্ব ও
তাৎপর্যকে এই হিসেবে আলোচনা করা উদ্দেশ্য যে, হজু পুরোটাই এমন একটি
ইবাদত যা আল্লাহর প্রেম ও মুহার্বতের বহিঃপ্রকাশ করে। তা যেন আল্লাহর
প্রেমের একটি দর্পণ, মুহার্বতের প্রদর্শনী। কখনো তা যুক্তি ও বুদ্ধির নিকিতে
ওজন করা যায় না।

কুরআন মজীদে এই ফরয বিধানের আলোচনা করা হয়েছে এভাবে-

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-আর মানুষের উপর আল্লাহর বিধান হল, যারা সেই ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে
পারে তারা হজু করবে।^১

উক্ত আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ তাআলা সে সব লোকদের উপর হজু ফরয করে
দিয়েছেন যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সক্ষমতা
রাখে।

মানব-প্রকৃতি ও প্রেম

হজু কি? এবং হজুরের উদ্দেশ্য কি? তা বোঝার জন্যে প্রয়োজন মানব ব্যক্তিত্বের
বিশ্লেষণ।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সৃষ্টির সেরা মানুষকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত সত্তা
হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকুলে সে এমন সর্বব্যাপী সমন্বয়তা ও পূর্ণতা রাখার
কারণেই তাকে শ্রেষ্ঠ মাখলূক বলা হয়। মানবব্যক্তির গঠন-উপাদানের যদি
পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন তার সৃষ্টি-উপাদানে দেখা যাবে যে, তা শুধুমাত্র বিবেক-
বুদ্ধি, জ্ঞানশক্তি ও চিন্তা-চেতনার নাম নয় বরং বিশ্বস্তা তার মাঝে বিভিন্ন ধরণের
যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং ভালোবাসা ও মুহার্বতের আবেগ-অনুভূতি ও দান
করেছেন। যে কারণে তাকে বিবেক-বুদ্ধি যেমন দিয়েছেন তেমনি তার সঙ্গে একটি
অন্তরও দিয়েছেন। অর্থাৎ বুঝ-ব্যবস্থার গুণের সঙ্গে কোনো কিছুর কামনা-বাসনার
প্রেরণাও দিয়েছেন। বোঝা ও চাওয়ার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল, চিন্তা ও

^১. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭

বুবাশক্তি যেখানে লাভ-লোকসান ও ক্ষতি-উপকারের অনুগামী হয়, আর মানুষ কোনো কাজ করার আগে তার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভেবে দেখে। এটি করব কি করবনা; সেখানে প্রেমের চাওয়া-পাওয়া ওইসব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। মানুষ যাকেই মনে-প্রাণে ভালোবাসে, তার দিকে বস্তুগত লাভ-লোকসান থেকে নিজ বিবেক ও বুদ্ধিকে আগলে রেখে নির্বিধায় ও নিঃসঙ্গেচে দৌড়ে যায়। তার অন্তরলোকে সুষ্ঠু প্রেমের আকর্ষণ তাকে বাধ্য করে কোনো চিন্তাফিকির না করে প্রেমাস্পদের দোরগোড়ায় আপন দেহসন্তা-হৃদয়-সম্পদ সবকিছু বিসর্জন দিতে। দিল বা অন্তর যা প্রেমের বাসা তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে হাকীমে ইরশাদ করেন-

وَجَعَلَ لَكُمْ آلَسَمْعَ وَآلَبَصَرَ وَآلَفِيدَةَ

-তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর বানিয়েছেন।^১

অতএব, মানুষকে দৃশ্য পঞ্চেন্দ্রিয় (দেখা, শোনা, শোঁকা, স্বাদ নেওয়া এবং স্পর্শ করার শক্তি) আর অদৃশ্য সুষ্ঠু পঞ্চেন্দ্রিয় (মানব মস্তিষ্কের পাঁচটি অনুভূতিশক্তি) দান করা হয়েছে। তাছাড়া তাকে অন্তর, রুহ ও মেধা দিয়েও সৌভাগ্যবান করা হয়েছে। এই সব মৌল উপাদানসমূহের সমষ্টিতেই মানবসন্তার অবয়ব নির্মিত হয়। বিশ্বস্তা তার হৃদয় মুকুরে কারো প্রেমে পড়ার একটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ গচ্ছিত রেখেছেন। ঈমান-বিশ্বাস, আনুগত্য ও ভালোবাসার সুষ্ঠু আবেগ-অনুভূতি দিয়েও তাকে ধন্য করেছেন।

এই কারণেই মানুষের বিভিন্ন অবস্থান আছে, যাতে প্রেমের চাহিদার পূর্ণতা লাভের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মানব তার প্রেমবিবরহের প্রত্যাশিত সুখ ও শান্তি খুঁজে পায় এবং তার পরিপূর্ণতার পাথের ও সুযোগ পায়।

প্রেমের বহিঃপ্রকাশ কুরআনের দৃষ্টিতে

এ ব্যাপারে কোরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে-

زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الْشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

-মানবকুলকে মোহগ্ন করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি।^২

মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতেই যেন এটা শামিল আছে যে, তার অন্তরে নারী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ভালোবাসা ও আন্তরিক টান রাখা হয়েছে।

জাগতিক মুহাবরতের বিভিন্ন রূপ ও বহুবিধ প্রকার থাকতে পারে। নারীর প্রেম, পদমর্যাদার প্রতি আকর্ষণ, পার্থিব জিনিসপত্রের মোহ, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি বিভিন্ন পথ রয়েছে যার প্রতি কুরআনের এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে জানান দেয়। এখানে এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য যে, এই সব মুহাবরত ও প্রেমের প্রকাশস্থল যার দিকে মানুষের আসক্তি ও আকর্ষণ সে ওসবের প্রতি আকৃষ্ট হয় স্বভাবগতভাবে এবং তার অন্তরে এসবের সম্মান ও দাম আছে তা মানবিক প্রয়োজনেই।

জাগতিক ভালোবাসার সঙ্গে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাবরতের তুলনা

জাগতিক প্রেম-ভালোবাসার একটি সীমানা আছে, তা যদি অতিক্রম করে যায় তখন তা মানুষকে মধ্যমপন্থা ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন সূরায়ে তাওবায় আল্লাহ রাকুন ইজ্জত প্রেম ও মুহাবরতের বিষয়বস্তু গণনা করে তার ফলাফলের ব্যাপারে বলেছেন-

قُلْ إِنَّ كَانَ ءابَاؤكُمْ وَأَبَائُؤكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ أَقْرَفْتُمُوهَا وَتَحْمِرَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنْ

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي

سَبِيلِهِ فَرَرَصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

-বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।^৩

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মোধন করে বলেন, আপনি তাদের বলে দিন যে, উপরে সবিস্তারে বর্ণিত এসব বন্ধুর মুহাবরত যদি আল্লাহ ও রাসূলের এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে বেশী

^১. আল-কুরআন, সূরা মুলুক, আয়াত : ২৩

^২. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪

প্রিয় হয় তো তাদেরকে পরিগামে ধ্বংস ও বিনাশের পথেই নিয়ে অপমান অপদস্থতার অতল গহ্বরে নিষ্কেপ করা হবে। অবাধ্য যারা এবং যারা পাপে জড়িয়ে যায় আল্লাহর প্রদত্ত হিদায়াত তাদের নসীব হয় না, তাদের তাকদীরে আয়াব নিশ্চিত হয়ে যায়।

সুতরাং এটি স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, এসব পার্থিব মুহাব্বত ও ভালোবাসা মানুষের মূল প্রকৃতিতেই নিহিত আছে। পিতামাতার মুহাব্বত, স্ত্রী-সন্তানের মুহাব্বত, গোত্র ও বংশের ভালোবাসা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মুহাব্বত, আকর্ষণীয় ইমারত ও বস্ত্রের মুহাব্বত; এইসবের অর্জন তার জীবনের একটি লক্ষ্য, আর তাতেই তার অর্তজুলা প্রশংসিত হয় এবং সুপ্ত প্রেমের বিরহ পায় সাম্ভূনা। এখানে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, এসব পার্থিব প্রেম-মুহাব্বত ও আকর্ষণকে সম্মুখে শেষ করে দেওয়া আল্লাহর ইচ্ছা কখনো নয়। তাই মানুষের কাছ থেকে আদৌ কাম্য নয় যে, তারা সে সব মানবীয় চাহিদা ও আকর্ষণকে তাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বের করে দিবে; বরং ওই প্রধান বিষয়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, এই সব জাগতিক প্রেম ও মায়া-মমতা আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বত এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উপর যেন প্রাধান্য না পায়। যদি আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বত এবং জিহাদের প্রেরণা ও উৎসাহ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মুহাব্বতের উপর অধিক ও পর্যাপ্ত থাকে তা হলে ঈমানে কোনো সমস্যা হবে না এবং পার্থিব মুহাব্বত নিজে নিজেই বিলুপ্ত হতে থাকবে আর তা একটি সীমানাতেই থাকবে তা থেকে আর অগ্রসর হতে পারবে না।

মুহাব্বতের অগ্রযাত্রা : ঝুপক থেকে বাস্তবতার দিকে

আল্লাহর মেহেরবান যাত মানুষের ইশক ও মুহাব্বতের প্রাপ্য সুখ-শান্তির জন্য পার্থিব এই জাহানে অসংখ্য উপাদান রেখেছেন। পার্থিব প্রেম দুনিয়ার কোনো প্রেমিকের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ও অতি আকর্ষণের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই মুহাব্বতের এমন একটি পর্যায় আছে যেখানে প্রেমের আবেগ-উভাপ নিষ্ঠেজ হয়ে পড়ে এবং মধুর টান ও ভালোবাসার সম্পর্কে ধীরে ধীরে ভাটা পড়ে যায়। মুহাব্বতের আবেগ ও উদ্দীপনা যদি সততা ও ইখলাসের উপর ভিত্তি করে জন্ম নেয় তা হলে তার প্রতিটি কদমে কদমে আল্লাহর সাহায্য ও নুসরাত থাকে। আর তার সুপ্ত আবেগ-অনুরাগের প্রশান্তির জন্য ওই পথ সাঁজানো হয় যার দরজন পর্থিব ক্ষণস্থায়ী প্রেম ভালোবাসার দাগ তার হৃদয়পট থেকে মুছে গিয়ে তদন্তলে সেই চিরস্থায়ী প্রেমের ছবি এঁটে যায় যা প্রকৃত বন্ধু ও মাহবুবে হাকিকীর চিরস্মারক হয়। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাগণকে আলোর পথের নির্দেশনা দেন-

وَالْذِينَ ءامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ^১

-যারা ঈমানদার, তাদের কাছে একমাত্র আল্লাহর মুহৰ্বতই সবচেয়ে বেশি।^১

আয়াতে করীমাতে ঈমানদারদের চরিত্র বলা হয়েছে যে, যতই তার ঈমান পূর্ণতায় পৌছবে সে পার্থিব প্রেমিকদের থেকে কেটে পড়বে এবং মাহবুবে হাকিকী যিনি, অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার যিনি তাকেই প্রাণভরে ভালোবাসতে থাকবে। তাদের হৃদয়জগতে যখন ইশকে ইলাহির অনল জুলে তখন জগতের সকল বস্ত্রের প্রেম ভালোবাসা খড়কুটো হয়ে এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। আর আল্লাহর ইয়াদ ও স্মরণে উভাসিত হয় তাদের হৃদয়প্রাপ্তর। বিধাতার প্রেম ও মুহাব্বত যখন অন্তর ও কলবে স্থান করে নেয় তখন তার ধরণ নিষ্ক গতানুগতিক, নিয়মমাফিক ও যুক্তিনির্ভর হয় না; বরং এমন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর আন্তরিক বন্ধুত্ব আল্লাহর সঙ্গে হয়ে যায় যে, তার ভালোবাসার বাটখারায় অন্যসব সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হয়ে যায় নির্থক, নিষ্ফল ও সারইীন।

মুমিন বান্দা এবং দার্শনিকের বন্ধনে পার্থক্য

আল্লাহর সঙ্গে বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা শুধুমাত্র দার্শনিক ও যুক্তি বিজ্ঞানীর কাজ। যে যত বড় দার্শনিক হবে তত সে যে কোনো কাজে দর্শন ও যুক্তি খাটানোর জন্য মাথার ঘাম ঝরাবে। আল্লাহর যাত ও সন্তা এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলি প্রমাণ করতে যুক্তিনির্ভর প্রমাণ বের করার জন্য দিনরাত সে মশগুল থাকে। তবে কোনো দার্শনিক কখনো ঈমানদারের মর্যাদা ও মকাম অর্জন করতে পারে না। কেননা, তাদের উভয়ের মাঝে প্রধান পার্থক্য হল, দার্শনিক যে কোনো কথায় দর্শনের সাহায্য নেয় আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক গতানুগতিক, সাধারণ নিয়মানুসারে করার চেষ্টা করে অথচ ঈমানদার বান্দার সমন্বয় তার রবের সঙ্গে সাধারণ নিয়ম ও পরিচিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক উৎৰে। সে তার রবের সঙ্গে ওইরূপ সম্পর্ক ও মুহাব্বত কায়েম করতে চায় যে সম্পর্কে রয়েছে ইশকের টান, প্রেমের আলোড়ন ও আবেগ-অনুরাগের স্বাদ। তড়প-উদ্বেলতা, ত্যাগ-বিসর্জন ও দহন-জ্বলনে পরিপূর্ণ প্রেমের সম্পর্ক এ পর্যায়ে থাকবে যে, তা ঈমানদার বান্দার অন্তরে আকুলতা ও অস্থিরতার লু হাওয়া ছড়াবে। অতঃপর সে শয্যা ছেড়ে দিয়ে রাতের নির্জনে উঠে উঠে নিজের রবের দরবারে অশ্রু নয়রানা নিয়ে উপস্থিত হয়। এবং তাকে রায়ি করার জন্যে অস্থির থাকে।

আল্লাহ তাআলা বান্দার এরূপ প্রীতিময় সম্পর্ক চায় যেখানে বিবেক-বুদ্ধির সুযোগসুবিধা, নিয়ম-নীতির তোয়াজ-তোয়াক্তা আর আত্মীয়তার বন্ধন সবই ভুলে যায় আর মুহাবতের সম্পর্ক জুনুন ও চরম প্রেম-উন্নততার পর্যায়ে পৌছে যায়। এই অবস্থায় উপনীত হয়ে ঈমানদার বান্দা আল্লাহর হৃকুম-আহকাম কোনো দ্বিষাসংশয় ছাড়া মাথা পেতে মেনে নেয়। কোনো বিষয়কে যুক্তি বা কিয়াসের কষ্টপাথরে নিরীক্ষা করেনা। মুহাবত আত্মনিবেদন ও আত্মবিসর্জনের দাবি করে। বিচার-বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণের সাথে তার কোনো দূরসম্পর্কও নেই। সে তো বরং প্রেমাস্পদের চেখের ইশারাতেও আপন মান-মর্যাদা, আরাম-আয়েশ ও নাম-ধাম পর্যন্ত এমনকি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুঠাবোধ করবেন।

ঈমানদার বান্দা ও ইশক-মুহাবতের কারিশমা

ঈমানদার বান্দার আল্লাহর সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক তা তাকে দুনিয়াসহ অন্যসব বিষয়াসয় থেকে বিমুখ করে দেয়। তার রাতের মুহূর্তগুলি রংকু-সিজদা, কান্নাকাটি, আবেদন আকৃতির অপর নাম। পরম আকুলচিত্তে সে বিনীত প্রার্থনায় অশ্রসিঙ্গ মুখমণ্ডলে সিজদায় গড়াগড়ি করে। বিবেক ও যুক্তি ওইসব বিষয় থেকে কোনো একটিকেও অনুমতি দেয় না। কায়দাকানুন ও নিয়মনীতি এসব আবেগ অনুভূতির ব্যাপারে আদৌ পরিচিত নয়। কেননা, এসব কর্মকাণ্ড যুক্তি-বুদ্ধির আওতায় পড়ে না। বরং এইসব ইশক ও মুহাবতের কারিশমা ও অভূতপূর্ব কর্মলীলা। নিজ অবস্থায় ধ্যানমণ্ড বান্দা যে নির্ঘুম রজনী কাটায় আর নির্জনে রংকু-কিয়াম-সিজদায় লিঙ্গ থাকে তাদের আলোচনা আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্রিত্ব কুরআনে এভাবে করেন-

وَالَّذِينَ يَبِيُّونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيْمًا

-এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবন্ত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে।^১

তাদের আলোচনায় অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

-যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে শ্মরণ করে।^২

আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সকাল বিকাল রবের দর্শন লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহে তাঁকে ডাকতে থাকে আর এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ইশক ও মুহাবতের উপর। এখানে এ কথাটি মনে রাখা দরকার, বান্দার প্রকৃতিতে এই জিনিসটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, সে যে জিনিসকে মুহাবত করে ভালোবাসে তাকে কোনো না কোনো অবয়ব ও আকৃতিতে তার আকাঙ্ক্ষিত নেত্রে সে তা দেখার জন্য অস্থির থাকে। ধৈর্য ও সান্ত্বনা তার হাতছাড়া হয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল এই কথাটি কতো যে মর্মস্পর্শী করে বলেছেন!

بُحْرَىٰ هِيَ مُقْرَنٌ نَّفَرَ رَبِّهِ مِنْ بَزَارِ مِيرَىٰ جِبِيلَ نَّيَارِ مِنْ

-কখনো হে প্রতীক্ষিত বাস্তব! অবাস্তবের লেবাসে এসে যাও। অজস্র সিজদা কাতরাছে আমার মান-অভিমানের ললাটে।

কথা চলছিলো প্রেমিকের। সে তার প্রেমবিরহের প্রশান্তি এবং বন্দেগীর সম্পর্ক পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য মাহবূব তথা প্রেমাস্পদকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করে। তার বিয়োগে প্রেমাস্পদের অলি-গলিতে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন প্রতিটি বস্ত্রের দর্শন লাভে সুখ অনুভব করে। প্রেমে কী চলে? তার কারণ্যারি জানতে চাও তো মজনুর কাছে জিজ্ঞেস করো। লোকেরা তাকে দেখেছে, একটি কুকুরের পায়ে চুমো খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হল, এ কি পাগলামি কাণ্ড করছো!? বললো, কি জানো তোমরা? এই কুকুর আমার লায়লার পথ দিয়ে হেঠে যায়।

بَلْ سَرِيدْ بِجَنُونٍ خَلْقَنْ گَفْتَ كَاهِيَّا بِسَرِيدْ بِرْفَتَ بِلْ

-কুকুরের পা চুমল মজনু। মানুষেরা বলল, ছি, এটা কী? মজনু বলল, এ কুকুর কখনো লায়লার গলিতে হাটে।

নির্দেশ মান্য করা এক কথা, প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য ও গুণমাধুর্য দেখে দেখে প্রাণবন্ত হওয়া এবং তাঁর খোঁজে ব্যাকুল অস্থির হয়ে পথে প্রান্তরে ঘূরতে থাকা অন্য কথা।

মুহাবতে অদম্যতার প্রকাশ

মুহাবতের বড় একটি চাহিদা হল, প্রিয়ের বিছেদের সময় প্রেমিক যখন প্রিয়ের সংশ্লিষ্ট কোনো জিনিস দেখে, তখন বেদনাতুর মন নিয়ে সেই জিনিসের দিকে দৌড়ায় এবং মনে-প্রাণে সেটা নিতে চায়। নিজের প্রিয়ের জন্য পাগলের মতো হয়ে যাওয়া এবং সবকিছু থেকে বিছিন্ন শুধুই প্রিয়ের জন্য একাত্ম হয়ে যাওয়ার কথা কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে,

^১. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৪

^২. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১

وَادْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلْ إِلَيْهِ تَبَّلِّا

-আর আল্লাহর নামের জিকির কর এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
একমাত্র তাঁর হয়ে যাও।^১

ভালোবাসার এমন স্তরে উপনীত হওয়া যে, সর্বদা মাহবুবের জিকিরই তার জবানে
লেগে থাকে, এটাই হল ভালোবাসার মূলদাবি। উল্লিখিত আয়াতে বান্দার কাছে
আল্লাহ এটাই চেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর কাছে ওইভাবে মুহাব্বত প্রকাশের জন্য কি কোনো
পদ্ধতি রাখা হয়েছে, যার মাধ্যমে বান্দার তাঁর ভালোবাসাকে উচ্চতার শীর্ষবিন্দুতে
নিয়ে যেতে পারে? ইবাদতের মধ্যে নামাজের কথা নিই। সেখানে দেখা যায়,
বান্দা নিজের রবের স্মরণে একাধিতা ও মনোযোগের জগতে ডুবে যায়, অশ্রু
নিবেদন করে, কিন্তু নামাজের কাঁদা, আহাজারি করাটা প্রেমাবেগকে শান্ত করে না,
বরং আরো অস্থির করে তুলে। অর্থাৎ বান্দার অন্তরে ইশক ও মুহাব্বতের আগুন
আরো জুলে ওঠে এবং মাহবুবের বিছেদের কারণে সৃষ্টি অস্থিরতা আরো বহুগুণে
বেড়ে যায়।

রোয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা। তার মাধ্যমে মাহবুবের আদেশ কার্যকরিত হয়, কিন্তু
প্রেমাগুন ঠাণ্ডা হয় না। তেমনিভাবে যাকাতের মাধ্যমেও মাহবুবের আদেশ পালিত
হয়, কিন্তু ইশক ও মুহাব্বতের আবেগ স্থিমিত হয় না। মাহবুবের আদেশ পালন
করা এক কথা, আর মাহবুবের শোভা-সৌন্দর্যে ডুবে গিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা
পাওয়া ভিন্ন কথা।

প্রেমের দাবির পূর্ণতাসাধন ও প্রশান্তির উপায় একমাত্র হজু

আমরা লক্ষ করেছি যে, নামায, রোয়া, যাকাত এবং অন্য যে কোনো নফল বা
ফরয ইবাদত দ্বারা তো আল্লাহর হৃকুম আদায় হয়ে যাবে। তবে ইশক-মুহাব্বত ও
প্রেমের ওই আগুন যা ঈমানদার বান্দার বুকে প্রেমাস্পদের বিয়োগে জুলছে তা
শেষ হবার নয়। অতঃপর বান্দা আপন রবের দিকে আপাদমস্তক প্রশ্ন হয়ে
মনোনিবেশ করে যে, তিনিই কেবল ইশক ও প্রেমের তাপ-উত্তাপ, আবেগ-
অনুরাগ মানুষের মাঝে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তো তার প্রশংসিত করার ব্যবস্থা
করবেন। তখন উত্তর মেলে, যদি ইশক ও মুহাব্বতের দাবি পূরণ করতে চাও তা
হলে আমার গৃহে হাজির হও হজু করার জন্যে। কেননা সমস্ত ইবাদতের মধ্যে

হজুই এমন একটি ইবাদত যা আগাগোড়া প্রেমনিবেদন ও গভীর ইশক ও
মুহাব্বতের আয়না, তাতে বুদ্ধিমুক্তির কোনো কার্যকরী প্রভাব নেই।

হজুর অনুসন্ধান ও গভীর পর্যবেক্ষণ যদি করা হয় তখন প্রতিভাত হবে যে,
হজুর মানসিক ও আরাকান হচ্ছে পুরাটাই শাআয়িরগ্লাহ (আল্লাহর
নির্দর্শনাবলি)'র সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহর প্রিয়দের স্মৃতিতে ইশক মুহাব্বতের
অসম চিত্রের নাম। আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করতেই নয়নযুগল বর্ষার দৃশ্য তুলে
ধরে। অশ্রুর প্রথম প্লাবনেই ওই প্রেম বিরহের প্রশান্তি তার অনুভূত হয় যাকে
বিয়োগের অসহ্য বেদনা আরো বেশী অস্থির করে দিয়েছে। খোদার গৃহে পা
দিতেই বান্দা পাগলের মতো পাথরে নির্মিত একটি দালানের চতুর্দিকে দৌড় এবং
চক্র শুরু করে দেয়।

সে এই নিরাপদ শহরে এই মনে করে পদার্পন করে, এটি আমার প্রেমাস্পদের
শহর। হারমে পৌঁছে সে এখনও সিজদা করে না, রুকু, কিয়াম বা নামায আরম্ভ
করেনা; বরং কা'বার গিলাফ দেখে তার চোখের কোঠা অশ্রুতে কানায় কানায়
ভরে যায়। চোখের পাতার তলদেশে বর্ষার অবোরধারা বইতে থাকে। তাকে যদি
কেউ জিজ্ঞেস করে, এই রূনাজারি, এই সিঙ্গতা কেন সৃষ্টি হয়েছে? তখন তার
কাছে বিবেকসমর্থিত কোনো উত্তর থাকেনা। সে তৎক্ষণাতভাবে এটাই শুধু বলে
দিবে, এসব আমি কিছুই জানি না। এটি আমার মাহবুবের ঘর, যা খোলাচোখে
দেখার বাসনা সারাজীবন হ্বদয়ে পুষ্টেছিলাম। আর এ মুহূর্তগুলো সেই আজীবনের
আরজুর জীবন্ত ছবি, যার জন্য হাজার মাইলের দূরত্ব উপেক্ষা করে এবং কঠিন
কঠের পাথর ঠেলে এখানে আসা হয়েছে।

মানসিকে হজু : ইশক ও মুহাব্বতের দর্পণ

অতঃপর সে হেরেমের সীমায় প্রবেশ করার পূর্বে নিজের মূল্যবান সেলাই করা
কাপড়গুলো খুলে সেলাইহীন কাফনসম সাদা কিছু কাপড় পরে নেয়। টুপি-পাগড়ি
বা মুকুট যেগুলোকে ইজ্জতের প্রমাণ মনে করত, সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
বিনয়ের জীবন্ত ছবি হয়ে, উলঙ্গমস্তক ও উলঙ্গপদ হয়ে আল্লাহর ঘরের উঠোনে
এসে পড়ে। শুধু তাই নয়, সে তখন দেওয়ানার মতো দৌড়া আরম্ভ করে এবং
কাবা শরীফের চতুর্পার্শে সাত চক্র ঘূরে যাকে হজুর পরিভাষায় তাওয়াফ বলে।
আবার এক কোণায় একটি পাথর দেখতে পায়, তখন শুরু সেদিকে দৌড়োঁপ।
শত ভীড়ের বেড়া ঠেলে সে তাতে চুমু দেয়। এ সবের যৌক্তিক-প্রমাণ সে পায়
না। সে শুধু এতটুকু বোঝে যে, এটাকে হাজরে আসওয়াদ বলে, যাকে আমার
মাহবুব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু দিয়েছিলেন। বাস, এই

^১. আল-কুরআন, সুরা মুয়্যাম্বিল, আয়াত : ৮

কারণেই শুধু সে তাতে চুম্ব দিতে পারাকে বহু বড় সৌভাগ্য মনে করে। বোঝাই যাচ্ছে, এসব কিছু শুধু প্রেমাঙ্গনের নিবারণ ছাড়া আর কী হতে পারে?

তাওয়াফ থেকে ফারেগ হয়ে সে একটি জায়গায় আসে, যেখানে সাইয়িদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদরেখা এখনো বিদ্যমান। সেখানে এসে থেমে যায় এবং সেজদাবনত হয়। ইরশাদ হচ্ছে-

وَأَنْجِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيٍّ

-তোমার ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানে নামায আদায় কর।^১

-এর আদলে সকল হজ্জ পালনকারীর জন্যে কিয়ামত অবধির চিরকাল্য নির্দেশ। এমনিতো পুরো ভূপৃষ্ঠ মুসলিম উম্মাহর নামায পড়ার উপযোগী, তারপরও এই স্থানকে বিশেষ করে নামাযস্থল বানানোর যে হুকুম তা এই কারণে যে, এখানে আল্লাহর এক প্রিয় বান্দার পবিত্র কদমের ছোয়া লেগেছে।

অতঃপর সে বায়তুল্লাহ থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত দুটি পর্বত সাফা-মারওয়া অবলোকন করে। ওগুলোর দিকে তার পা নির্বিষ্ণে ও নিশ্চিতে দৌড়ে যায়, গিয়ে সে একবার এই পাহাড়ে আবার ওই পাহাড়ে এভাবে সাতটি চক্র সম্পন্ন করে; যাকে সাফা-মারওয়ার সাঁজ বলা হয়। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, পৃথিবীতে শতসহস্র পাহাড় রয়েছে, তবে এই উভয় পাহাড়ের শান ও মান কিন্তু অন্যরকম। এই দু'পর্বতের সম্পর্ক আল্লাহর প্রিয় বাঁদী হ্যরত হাজেরা আর তাঁর কলিজার টুকরো হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে। এর উপর ভিত্তি করেই তাকে শাআয়িরুল্লাহর মর্যাদায় অভিষিঞ্জ করা হয়েছে।

অদ্য ইশক ও মুহাবতের দৃশ্য

আল্লাহর বান্দা ইহরাম পরে নগুমস্তকে যখন সাফা-মারওয়ার সাঁজ করে তখন তার অবাঞ্ছিত লোম বড় হয়ে যায়, চুলগুলো হয়ে যায় এলোমেলো, অগোছালো। যখন সে সাতটি প্রদক্ষিণ করে ফেলে তখন ওই চুলকেশ যা সে রূপ-শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে গুছিয়ে রেখেছিলো তা ক্ষুর দিয়ে মুণ্ডন করে ফেলে। বড় হয়ে যাওয়া নখ যা ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ থাকায় কাটেনি এখন কেটে ফেলে। আবার একসময় মিনার দিকে যায়, তাঁর টাঙায় এবং আরাফাতে গিয়ে সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করে। আরাফাতে যুহরের নামাযের সময় হয়, তখন যে নামায সারাজীবন আল্লাহর আইন-

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫

إِنَّ الْصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

-নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।^১

এর তামিলে সবসময় ওয়াক্ত মতো পড়তো সেখানে যুহর আর আসরকে এক সঙ্গে আদায় করে। এর কারণ কি? শুধু এই কারণে যে, তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আরাফাতের ময়দানে যুহর আর আসরকে একত্রিত করে পড়েছিলেন। তাঁর অনুসরণ করা আম-খাস সবার জন্যে ওয়াজিব হয়ে গেলো। এতে যুক্তিরুদ্ধির কোনো প্রবেশাধিকার নেই। এখানে না সফর, না যুদ্ধ-জিহাদ আর না অন্য কোনো বিশেষ প্রয়োজন। বাস, হুকুম হল যে, আসরকে যুহরের ওয়াক্তে পড়ো। মাগরিবের সময় হয়, সে পুরো যিন্দেগি সূর্য ডুবে যাওয়ার পরপরই মাগরিবের নামায আদায়ে সচেষ্ট ছিলো, কিন্তু এখানে এসে শরীয়তের সেই আইন আর বহাল থাকলো না। সে নামাযের ওয়াক্ত দেখে, তারপরও আদায় করা থেকে বিরত থাকে স্বেফ এই কারণে যে, আল্লাহর মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় নামায আদায় করেন নি। তিনি এই নামায মুয়দালিফায় গিয়ে ইশার সঙ্গে পড়েন।

মুয়দালিফায় পৌছার পর সফরে ক্লান্ত মানুষ ভাবে, রাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব। কিন্তু ডাক আসে, মুয়দালিফা ত্যাগ করে তাঁরু এখানে (মিনায়) টাঙাও এবং পাথরের খুঁটিকে শয়তান মনে করে পাথরকুচি নিষ্কেপ করো। যুক্তিরুদ্ধি লাখোবার বলে, এখানে শয়তান কই, দেখছি তো পাথরের খাদ্বা, তাতে কেন কংকর মারবে? কিন্তু ইশক বলে, এখানে হে যুক্তি তোমার হুকুম নয় আমার হুকুমই চলবে যে, ওইসব পাথরের খাদ্বাকে কংকর নিষ্কেপ করতে হবে। অতএব সে মুহাবত ও প্রেমের সামনে মাথা নত করে তিনিদিন ধরে তাতে পাথর নিষ্কেপ করে যাবে। এর কারণটা কি? কাজটি করেছিলেন আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা, তাঁর সঙ্গে এই কাজের সম্পৃক্ষতা। আল্লাহর নিকট এটি এমন পছন্দ হল যে, তাঁর সেই স্মৃতিকে দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত যাবত ধরে রাখার নির্দেশ দেয়া হল।

অতঃপর সে মিনায় গিয়ে কোরবানি করে। কোরবানি করার পর মক্কা নগরীতে ফিরে আসে। কখনো মরুপ্রান্তের যায় কখনো বনভূমি গিয়ে অবস্থান করে। আবার কখনো শহরে চলে আসে। প্রেমের অবাক লীলা খেলা! শাআয়িরুল্লাহর মান-মর্যাদার দিকে ভক্ষেপ না করে পাগলের মতো তাওয়াফ ও দৌড়াদৌড়ি সবকিছুই

^১. আল-কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১০৩

মুহাবতের দাবি ও এখানকার ভিন্নরকমের আদব! তার যৌক্তিক কোনো দলিল প্রমাণ মেলা ভার। বাস, আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের স্মৃতি, যা জগত রাখার উপলক্ষ্মৈ ইবাদতের স্থানে রাখা হয়েছে।

শাআয়িরুল্লাহর সম্মান ও হজু

শাআয়িরুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে হজু অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। আল্লাহর ইরশাদ হয়েছে-

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعْبَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿١﴾

-বাস্তবতা হল, আল্লাহর নির্দর্শনাবলির আদব-ইতিহাস তো অন্তরে আল্লাহর তাকওয়া থাকারই প্রমাণ।^১

শাআয়িরুল্লাহর মর্যাদা, সম্মান ও আদব রক্ষা করা আল্লাহর কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে অন্তরের তাকওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এমনি তো পাহাড়-পর্বত, পাথর আর কোরবানির পশু পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর চেয়ে তেমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় ও মাকবূল বান্দাদের সঙে সম্পৃক্ততার কারণেই ওগুলোর আদব-সম্মান এত মহান ইবাদত হয়ে গেছে যে, তা তাকওয়ার পরিচায়ক। ইরশাদ হচ্ছে-

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿٢﴾

-এ বিধানসমূহ স্মরণ রেখ। আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম।^২

তো যে ব্যক্তি শাআয়িরুল্লাহর মর্যাদা এবং আদব বজায় রাখবে তার এই কর্ম আল্লাহর উপরোক্ত ইরশাদ অনুযায়ি আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

ইবাদত ও আদবে পার্থক্য

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবাদত হয় আল্লাহর জন্য আর আদব ও সম্মান প্রদর্শন হয় আল্লাহর মাখলুকের জন্য, তার সঙে ইবাদতের কোনো সম্পর্ক হতে পারে না। শাআয়িরুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার হৃকুম যখন করা হচ্ছে তখন

^১. আল-কুরআন, সূরা হজু, আয়াত : ৩২

^২. আল-কুরআন, সূরা আমিয়া, আয়াত : ৩০

পর্দার অন্তরালে এই হিকমত ও রহস্য নিহিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রেম ও মুহাবতের বিষয়কে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা ও বুলন্দ মাকাম দান করেছেন। তা এরূপ যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর আমিয়ায়ে কিরাম ও মাকবূল বান্দাদের ইতিহাস ও দাস্তান এবং জীবনের ওই সব ঘটনাবলিকে বেছে বেছে মানবজাতির সামনে রেখেছেন যা ইশক-মুহাবত, আত্মবিসর্জন, বিশ্বাস ও ত্যাগের অধ্যায়ে একেকটি মহাআদর্শ হতে পারে সকলের জন্যে। তাই শাআয়িরুল্লাহর স্মৃতিচারণকে মনে-প্রাণে জাগরুক রাখার জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেন

কাহে কাহে বাঞ্ছাই পারিশে

-‘মাবো মাবো পুরনোদের কাহিনী মনে কর।’- এর পয়গাম দেয়া হয়েছে বিশ্বের সমস্ত মানব-সমাজকে।

ইবরাহিমী পরীক্ষার ঈমানদীপ্তি ঘটনাবলি

প্রথম পরীক্ষা

হ্যারত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রেমিককুলের সরদার। আমিয়ায়ে কিরামের দাদা হওয়ার সুবাদে কুরআন মজীদ গুরুত্বসহকারে তাঁর ইশক ও মুহাবতের দাস্তান, লোমহর্ষক পরীক্ষার ঘটনাবলি এবং নমরান্দের অগ্নিস্তুপে নিঃসংকেচে লাফিয়ে পড়ার ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছে। এই ঘটনার ব্যাপারে রেওয়ায়েত এসেছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা তাঁর দরবারে এই আরয় নিয়ে উপস্থিত হল, যদি চান তো নমরান্দের অগ্নিকুণ্ডকে ডানা মেরে উল্টে দেব, কিন্তু আনুগত্য ও সন্তুষ্টির এই মূর্ত্প্রতীক প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা থেকে পলায়ন করেন নি এবং পরিণতি কি হবে তার পরওয়া না করে

بِخَطْرِ كُوْدَرْ آشْ نَرْوَدْ مِنْ عَشْ

‘নির্দিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রেম নামরান্দের আগুণে।’

-এর শিরোনাম ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠে অঙ্কিত করে রাখেন। ইশকের এই অগ্নি পরীক্ষার সাফল্যের আলোচনা যা

قُلْنَا يَسْتَأْرُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿٣﴾

-আমি বললাম, হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।^৩

এই বাক্যে কুরআন মজীদ করেছে, যা আম-খাস (সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণী) সকলের মুখে আজও শোনা যায়।

তৃতীয় পরীক্ষা

সাইয়েদুনা হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ইশক ও মুহাবতের তৃতীয় পরীক্ষা হয়েছে যখন একমাত্র পুত্র দুঃখপোষ্য ছিলো। নির্দেশ হল, প্রিয় স্ত্রী হাজেরা এবং শিশুসন্তানকে মরণপ্রাপ্তরে রেখে এসো।

হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পরীক্ষার এই পর্বকেও হাসিমুখে এবং সফলতার সঙ্গে অতিক্রম করেন। মক্কার পার্শ্ববর্তী অনাবাদি উপত্যকায় তাঁদের রেখে দেন। এই পরীক্ষার আলোচনা কুরআন মজীদে এসব বাক্যে করা হয়-

إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

-আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি।^১

এটি তখনকার কথা যখনও পর্যন্ত কা'বার নির্মাণ হয়নি। কিন্তু আকাশের দৃষ্টিশক্তি অবলোকন করছিলো, এই পবিত্রস্থান যেখানে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় সহধর্মীনী ও কলিজার টুকরো সন্তানকে রেখে যাচ্ছিলেন- আল্লাহর ঘরের জন্যে নির্বাচন করা হল। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় কা'বার নতুনরূপে নির্মাণ হল, যা ভূগূঢ় থেকে কখনো মুছে যাওয়ার নয়। কুরআন মজীদ সেই সুমহান স্মৃতিবিজড়িত ঘটনাকে অবিনশ্বর শব্দে চিরকালের জন্য ইসলামের ইতিহাসে সংরক্ষিত করে রাখলো।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

-স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল।^২

কী যে দেখার দৃশ্য ছিলো! বাবা নির্মাতা আর পুত্র সাহায্যকারীর ন্যায় কা'বার ভিত্তিস্থাপন করছিলো। যখন ওই ঘরটি নির্মিত হল তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ঘোষণা করে দেওয়া হল, এই গৃহটি যা আমার দু'জন প্রেমিক রক্ত আর ঘাম ঝরিয়ে নির্মাণ করলো এটি আমারই ঘর। আমার এই মাকবূল ও প্রিয় বান্দারা

যাদের উপর আমার ইশক ও প্রেমের যত কঠিন পরীক্ষা এসেছে তাতে তারা সফল হয়েছে, তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। এখন তাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ার সময় এসেছে। অতএব হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অস্তরের অস্তঃস্থল থেকে নির্গত দোআ আল্লাহর কাছে কবূল হয়ে গেলো। ফলে হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে শেষনবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হল আর হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শ্রদ্ধের দাদাজানের স্মৃতিগুলোকে মুহাম্মদী শরীয়তের অবশ্য পালনীয় অঙ্গ করে দিয়ে হজ্জের আরকান ও মানাসিকের আকৃতিতে দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত জারি করে দিলেন।

তৃতীয় পরীক্ষা

হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তৃতীয় পরীক্ষার পর্ব এলো ওই সময় যখন বুড়ো বয়সের একমাত্র সম্বল ও একটি মাত্র সন্তান হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম আদর আর সোহাগে যে বড় হয়েছে তার ব্যাপারে নির্দেশ এলো তাকে আমার উদ্দেশ্যে কোরবানি দাও। কুরআন মজীদে পিতাপুত্রের যে কথোপকথন উল্লেখ হয়েছে তা কোরবানির ইতিহাসের একটি কালজয়ী অধ্যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَتَامِرِ أُنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ

قَالَ يَتَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَحْدِنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

-ইবরাহীম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল, পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।^৩

ইশক ও প্রেমের পরীক্ষায় পিতাপুত্র যাঁরা একমাত্র সন্তা আল্লাহর আশিক ও প্রেমিক ছিলেন নিঃসঙ্গে ও নিঃনির্ধায় নিজেদেরকে সঁপে দিলেন। পিতা ছুরি হাতে নিয়ে পুত্রের গলার দিকে এগুলেন আর পুত্র আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের জীবন্ত নির্দশন হয়ে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য। অভিশাঙ্ক শয়তান লাখো ধোকা ও প্রতারণা দেওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু তাঁদের পর্বতকঠিন দৃঢ়পদে বিন্দুমাত্র বিচুতি হয় নি। পিতা ছুরি চালালেন পুত্রের গলায়। আত্মসমর্পন ও বিসর্জনের কী অস্তুত দৃশ্য! আর আকাশের নেত্রমনি

^১. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৭

^২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৭

^৩. আল-কুরআন, সূরা সাফাফাত, আয়াত : ১০২

আকাশের নিচে সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করছিলো যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাস দেখাতে অক্ষম। আগ্নাহৱ রাস্তায় হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের কোরবান হয়ে যাওয়ার উৎসাহ ও প্রেরণা কোরবানীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়, নিজেই দৃষ্টান্ত নিজের। ইকবাল মরহুমের ভাষায়-

یہ نیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی ☆ سکھانے کس نے اما عیل کو آداب فرزندی -‘�ٹا کی ہیل سونج ر، نا کونو مکاتبے کے کارامات؟ اس مادل کے شوخال کے پوچھنے کے شیڈا ر؟’

হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কোরবানির এই শুভ্রি আল্লাহ তাআলার
দরবারে এমন কৃতিয়াতের গৌরব অর্জন করেছে যে, এই ‘যিবহে আযীম’
(মহিমাধিত উৎসর্গ)র শুভ্রিকে দুনিয়ার শেষ দিবস অবধি কোরবানির আলামত ও
চিহ্নস্বরূপ চিরগুৰুত্ব করে দিলেন। হ্যরত ইবরাহীম আর হ্যরত ইসমাঈল
আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে যেন্নপ বিলীন ও সমর্পণ করে
দিয়েছেন তার আলোচনা কুরআন মজিদ এভাবে করেছে-

فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُر لِلْجَبَينِ ﴿٢﴾ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَابَرَاهِيمُ ﴿٣﴾ قَدْ
صَدَقْتَ الْرُّءْيَاً إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤﴾

-যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে
যবেহ করার জন্যে শায়িত করল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে
ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই
সৎকর্মদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।’

সেই মহা কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের শুভসংবাদ কুরআন মজিদ শোনালো এই
ভাষায়-

إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْئُوْأَ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۝

-নিচয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ
করার জন্যে এক মহান জ্ঞান ।^২

মহান আল্লাহর কাছে তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের কাজগুলো এতই পছন্দ হল যে, এই ঘটনাকে ‘যিবহে আযীম’ আখ্যা দিয়ে প্রতি বছর তার স্মৃতি জাগানোর বিধানকে উন্মাতে মুহাম্মদীর শরীয়াতের অনুষঙ্গ করে দিলেন, যার অনুসরণ কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাতে ইবরাহিমী স্বরূপ ওয়াজিব হয়ে থাকল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজুর ঐতিহাসিক পটভূমি

ডুপুঠে সর্বপ্রথম যে গৃহটি ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় আর হারানো মানবতার হিদায়তের আলোক মিনার হিসাবে প্রথম কেন্দ্রুপে স্থান পায় কুরআন মজিদের সুস্পষ্ট ঘোষণায় তা হল কা'বা, যার ভিত্তি আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালনার্থে একজন মহান ও অটলপ্রতিজ্ঞ নবী হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্র হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সাহায্যে আরব উপন্থীপের প্রাচীন শহর মক্কাতে স্থাপন করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

-নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়ত ও বরকতময়।^১

এই আয়াতে করীমাটি স্পষ্টত ইঙিত করছে এ কথার প্রতি যে, পৃথিবীর বুকে আদম আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পর মক্কা-ই মুয়ায়মা মানবজাতির হিদায়তের উৎসভূমি ও সর্বপ্রথম কেন্দ্র হওয়ার মর্যাদা বহন করে। ইতিহাস পর্যালোচনায় একথা প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, যে মোবারক ভূখণ্টিকে আল্লাহর ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করা হল তা কোনো অনাবাদি কিংবা পরিত্যক্ত অঞ্চল ছিল না; বরং বহুকাল ধরে তা জনমানুষের আবাসভূমি রূপে চলে আসছে। আর যেহেতু ওই পবিত্র স্থানটিকে আগামী প্রজন্মের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাত্রকেড় হতে হবে তাই সেই প্রথম ঘরটির নির্মাণের মহৎকর্ম এমন মনীষী দ্বারা সম্পন্ন হয় যারা আল্লাহর অতি প্রিয় ও তাঁর একান্ত মনোনীত।

আল্লাহ! আল্লাহ! সেই দৃশ্যটি কেমন হবে যখন মানবতার প্রথম কারিগর ভারি প্রস্তর ও কাদামাটি কাঁধে তুলে তুলে নির্মাণ করতে ছিলেন সেই শাশ্বত স্মৃতিসৌধ, যার চিরস্থায়িত্ব হওয়া ছিল এই ধরাতলে। কুরআন মজিদে সেই প্রথম নির্মাণের কথা এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে-

**وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ أَلْبَيْتٍ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَفَّلَّ
مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ**

-স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কা'বাগুহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল, পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।^১

ইতিহাসের আলোকে জানা যায় যে, আল্লাহর প্রথম ঘরটির নির্মাণকর্ম আঞ্চাম দিয়েছিলেন মানবজাতির আদিপিতা হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম, আর শতাব্দীকাল ধরে তা দাওয়াত ও তাবলীগের সূতিকাগার হিসেবে চলতে থাকে। অতঃপর হ্যরত নূহ আলাইহিস সালামের আমলে কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহিতা চরম আকার ধারণ করলে তাঁর দোয়ায় সর্বগ্রাসী বন্যা ও জলোচ্ছাস (Great Deluge) হল, যার ফলে কুফর-শিরকের বিন্দু-কণিকা দুনিয়ার পৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেয়। রেওয়ায়াতে আছে, হ্যরত নূহ আলাইহিস সালামের ভয়াবহ বন্যায় কা'বাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিলো, পৃথিবীতে তার কোনো চিহ্ন ছিলো না।

মক্কা ভূমির মহত্ত্বের কারণ

পৃথিবীর সেই পবিত্র স্থান যাকে আল্লাহর মহিমান্বিত গৃহের জন্য মনোনীত করা হয়েছে তার এই সম্মান ও মর্যাদা এ কারণে অর্জন হয়েছে যে, আগামীতে তাকে উভয় জাহানের সরদার নবীকুল শিরোমনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হবে। সেই আরবে ফারানের শীর্ষচূড়া থেকে সেই চির জাজুল্যমান নূর ও ঐশী জ্যোতির প্রকাশ হবে যার আলোকেন্দ্রাসে একদিন বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিম জেগে উঠবে আর সকল অঙ্ককার হবে বিদূরিত; যার করণায় জগতের প্রভুভোলা লোকদেরকে তাওহীদের বিস্মৃত পাঠ পড়ানো হবে, আর অঙ্ককারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া ভূবনকে হিদায়তের আলোকবর্তিকায় আলোকোজ্জ্বল করে দেওয়া হবে। এই কারণেই তো কা'বার নির্মাণের পর সেখানে এসে বসবাস শুরু করে দিলো ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিবার-পরিজন, যার সৌভাগ্যের ললাটে দিব্যি জুলজুল করছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃত্বের মর্যাদা। তারপর সেই

চিরদীপ্তি অপূর্ব নূর পবিত্রতম বংশের স্বোতধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে এলো আমেনার পানে, তাঁরই কোলে প্রকাশ পেলো সেই কাজিক্ষিত 'নূর'।

কা'বা : দাওয়াত ও তাবলীগের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

একান্ত ঈমান ও ইখলাসে কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যদিও এই নির্মাণটি নিতান্ত সাদামাটা ও বাহ্যিক সাজসজ্ঞামুক্ত ছিলো, কিন্তু তাতে সেই অলৌকিক আকর্ষণ ও চৌম্বিক বিকর্ষণ ছিলো যার কারণে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ দলে দলে ছুটে এসেছিলো তার ছায়াতলে। কুরআন মজিদ জগতবাসীর কাছে কা'বার সম্মান ব্যক্ত করে ইরশাদ করে-

فِيهِ ءَايَتٌ بَيْنَتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ

-এতে রয়েছে মকামে ইবরাহীমের মত প্রকৃষ্ট নির্দর্শন।^১

যেহেনে আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু হ্যরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পদচোয়া লেগেছে তা এমন উজ্জ্বল স্মৃতিবাহী নিশানের রূপ নিয়েছিলো যা যুগ যুগান্তরেও মানুষের হৃদয়জগত থেকে বিস্মৃত হয়নি কখনো। যে নির্মাণটির ভিত্তি গড়া হয়েছে পূর্ণ সততা ও ইখলাসের উপর, পৃথিবীর শেষদম পর্যন্ত তা থাকবে চির আলোকমিনার হয়ে। তাকেই বিশ্বময় তাওহীদের আলো বিকিরণ ও ইসলামের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। যে প্রকৃত সত্য-দ্বীন ও শরীয়তের বুনিয়াদ হ্যরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্বহস্তে কা'বার প্রাসনে রেখেছেন তা পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেন আরবের বালুপাথরের দেশে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বপনকৃত বীজটি শতাদীকাল পরে বিশ্বজাহানের জন্য শীতল ছায়াদায়ক একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়ে গেছে।

ইবরাহিমী দাওয়াতের বিশ্বজনীনতা

পুরো মানবজাতিকে একটি কেন্দ্রের আওতায় করার জন্যে মহান আল্লাহ তাআলা কা'বা নির্মাণের পর হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিলেন যেন পৃথিবীবাসীকে একটি গৃহে সমবেত হওয়ার আহ্বান করেন। কুরআন মজিদ সেই বিশ্বব্যাপী আহ্বানের আলোচনা এভাবে করেছে-

সুরা ফাতেহা মুকাবেলা মুকাবেলা মুকাবেলা

^১. আল-কুরআন, সূরা হজু, আয়াত : ১৭

وَأَدْنَى فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتِكَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ

-এবং মানুষের মধ্যে হজুর জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।^২

হাদিস শরীফে সেই আহ্বানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, হ্যরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আবু কুবাইস নামক পর্বতে আরোহন করলেন আর সেখান থেকে বিশ্বের প্রতিটি জনপদে অবস্থিত সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর ঘরে হাজিরি দেওয়ার জন্য বললেন। রেওয়ায়তে আছে, ওই ইবরাহিমী ঘোষণা শুধু ভূমণ্ডলের প্রাণীজগত শ্রবণ করেনি; বরং রহ জগতের বাসিন্দাদের কাছেও সেই আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছে আর তার উত্তরে প্রত্যেকে স্ব-স্ব যোগ্যতা মতে লাবাইক বলে সাড়া দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী হ্যরত ইবরাহীম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামকে আপন গৃহের মর্যাদা অঙ্কুণ রাখার নির্দেশ দিলেন এভাবে-

أَنْ طَهِّرَا بَيْتَ لِلْطَّارِفِينَ وَلَرْكَعْ عَلَسْجُودِ

-তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রূক্ত-সেজদাকারীদের জন্য পরিত্র রাখ।^২

কুরআনের এই আয়াতে মানবসমাজকে আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের আদব-কায়দা ও নিয়মকানুন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর গৃহটিকে সকল প্রকার পক্ষিলতা ও মলিনতা থেকে পরিত্র রাখার নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে সার্বিক দিক দিয়ে এটি আল্লাহর জামাল ও জালালের দর্পণ হয় আর স্বীয় মাহাত্ম্যের সেসব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৌন্দর্যের পরিচায়ক হয় যার মধ্যে তাঁর মহামহিম গুণাবলিবোধক শান প্রোজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। আল্লাহর এই ঘরটি অনন্য মহিমায় পৃথিবীর প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যে সকল মানুষের ইবাদত, তাওয়াফ ও সিজদার জন্য সার্বক্ষণিক ওয়াক্ফ হয়ে আছে। দিবারাত্রির কোনো একটি মুহূর্তও এমন নেই যাতে তাওহীদে বিশ্বাসীরা এই গৃহে ইবাদতে নিমগ্ন নয়।

^১. আল-কুরআন, সূরা হজু, আয়াত : ২৭

^২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫

বর্তমান মানব ইতিহাস ও হজু

বর্তমান মানব ইতিহাসের সূচনা হয় আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বে। সময়টি তখনকার যখন হয়েছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নববী ডাকের সাড়ায় কা'বা স্থাপনের পর প্রথম হজু পালিত হয়। সংরক্ষিত মানবিতিহাসের (Recorded History) সূচনা সেই যুগ থেকে। তার পূর্বের সময়কে অজানার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকায় তাকে ইতিহাসপূর্ব (Pre historic) যুগ বলা হয়। এ থেকে এই বাস্তবতাটি প্রতিভাত হয় যে, বর্তমান মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম স্থাপতি হলেন হয়েছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম; যিনি অজ্ঞতা ও বর্বরতার অন্ধকার জগতে বিপথগামিদের মাঝে নূর-প্রদীপ প্রজ্জলিত করেছেন। (ফিতরাতের ধর্ম হিসাবে) ইসলামের প্রথম দাঙ তথা আহ্বায়ক হলেন হয়েছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, যাঁর দাওয়াত ও দ্বীনের প্রচারের দরণ কুফর জগতে দৈমানের ও তাওহীদের আলো বিছুরিত হয়েছে এবং স্বহস্তে গড়া বাতিল খোদাসমূহের অহং ভূপাতিত হয়েছে।

হজুর ইতিহাসের সূচনা

ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে এই বাস্তবতাটি প্রতিয়মান হয় যে, শৃঙ্খলাবন্ধ নিয়মে হজুব্রত পালনের ধারা সূচিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের তিনি সহস্র বৎসর পূর্বে। আর তা কোনো না কোনো পন্থায় ও আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন পর্যন্ত চলমান ছিলো। কালের বিবর্তনে হজুর নিয়মপদ্ধতিতেও পরিবর্তন হতে থাকে, আর তাতে এমন সব রসম-রেওয়াজ ঢুকে পড়ে যা দ্বীনে ইবরাহীমীর পরিপন্থি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

হয়েছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাইলের কাছে হয়েছিল দাউদ আলাইহিস সালাম ও হয়েছিল সুলাইমান আলাইহিস সালামের মতো মহান পয়গাম্বরগণ যখন নবুওয়াতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন তখন বনী ইসরাইলের কিবলা বায়তুল মাকদাস ঠিক হল। তাঁরা আল্লাহর হৃকুমে তাঁদের যাবতীয় ইবাদত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে আদায় করতো। যখন বিশ্বনবী ও শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হল তখন দ্বীনে ইবরাহীমের অনুসারীরা বায়তুল মাকদিসকেই নিজেদের কিবলা বলে মান্য করতো। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরাও বেশ কিছুদিন যাবত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন। অবশেষে মহান আল্লাহ তাআলা প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোবাসনা পূর্ণ করতঃ

বায়তুল মাকদিসের পরিবর্তে হয়েছিল ইবরাহীম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের নির্মিত কা'বাকেই মুসলমানদের কিবলা করে দিলেন।

হজুর (ইবরাহীমী) 'মানসিক'-এ বিকৃতিসাধন

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নির্ধারিত হজু-কর্মপদ্ধতিতেও রদবদল ও পরিবর্তন হতে থাকে, হজুর আকার-আকৃতি ও নিয়মপদ্ধতিতে একের পর এক পরিবর্তনের কারণে অস্বাভাবিক বিকৃতি হতে থাকে। অবশেষে এমন ভিত্তিহীন কতক কুসংস্কারের রূপ ধারণ করলো যা হয়েছিল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মূলশিক্ষার সাথে আদৌ কোনো সম্পর্ক রাখে না। পবিত্র কুরআন মজিদ বিভিন্ন স্থানে সেসব বিকৃতি ও কুসংস্কারের আলোচনা করেছে।

১. একটি কুসংস্কার ছিলো ইহরাম সম্পর্কিত যা আরবদের নিকট ব্যাপক প্রচলিত ছিলো। আরবরা হজুর উদ্দেশ্যে ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর ঘরের মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করাকে হারাম বলে ধারণা করতো। তাই তারা ঘরের পশ্চাতের কোনো দেওয়াল টপকে বা পেছন দিকের কোনো খিড়কি-জানালা ও ছিদ্রপথে ঘরে প্রবেশ করতো। এই কাজটিকে তারা মানসিক তথা হজু সংক্রান্ত ইবাদত বলে মনে করতো। কুরআন মজিদ সেই হাস্যকর ও মনগড়া রসমের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে যে, তাতে কোনো প্রকার মঙ্গলের ধারণা অমূলক। ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَيْسَ الْبَرُّ بِإِنْ تَأْتُوا الْبَيْوَكَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ

أَنَّقَ

-আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে।^১

আল্লাহর এই ইরশাদের আলোকে প্রতিয়মান হয়, কল্যাণ ও পুণ্য তো একমাত্র তাকওয়াতেই; এরূপ ঘরের কোনো দেওয়াল টপকে প্রবেশ করাতে কোনো মঙ্গল কামনা করা নিছক ভুল ধারণা। কুরআন মজিদ পুণ্য আশা করা যায় এরূপ কাজকর্মের নীতি বয়ান করে সে সব ভিত্তিহীন প্রথাসমূহকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

^১. আল-কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৯

২. জাহেলি যুগে আরবদের মাঝে আরেকটি কুসংস্কার ও তাদের বিশ্বাস ছিলো যে, এক সফরে হজু আর ওমরা করা যাবে না। এই ভুল ধারণার কারণে তারা হজু ও ওমরা আদায় করার জন্যে পৃথক পৃথক মাস নির্ধারণ করে রেখেছিলো। একারণে তারা সফরও করতো ভিন্ন ভিন্ন। তাই যারা দূর-দূরান্ত থেকে আসত তাদের সীমাহীন কষ্ট ভোগ করতে হত। ইসলাম এসে এই মনগড়া ভ্রান্তধারণার মূলোৎপাটন করল। অতঃপর একই সফরে হজু ও ওমরা আদায় করার সুযোগ হয়ে গেল। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُوْ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَا

-নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নির্দশনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজু বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই।^১

ইসলাম ‘ধীনে ফিতরাত’ তথা স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ার কারণে পালন করতে সুবিধা। ইসলাম এজন্যই প্রেরিত হয়েছে যেন মানবসমাজকে আবহমানকালের ভ্রান্ত ধারণা ও ভিত্তিহীন চিন্তাধারার গর্হিত কুসংস্কারের জিঞ্জির থেকে মুক্তি দেয়। এ ব্যাপারে বিশ্বনবী হ্যরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী বিশেবভাবে প্রণিধানযোগ্য-

كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَنْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيْ مَوْضُوعٌ.

-জাহিলিয়াতের সকল কুসংস্কার আমার পদতলে নিষ্পেষিত করা হয়েছে।^২

৩. আরেকটি ভুলধারণা আরবদের মাঝে শিকড় গেড়েছিলো যার কারণে তারা হজু সফরের প্রাক্কালে যাবতীয় পাথেয় নেওয়া অবৈধ মনে করতো। তারা হজু গমন করবে কিন্তু তাদের সঙ্গে খাবার-দাবার ও অন্যান্য আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়াটা তাদের তথাকথিত তাকওয়ার বরখেলাফ হবে! কুরআন মজিদ ওই সব কুসংস্কারকে সম্মুলে উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছে-

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الْزَادِ الْتَّقْوَىٰ وَأَنَّقُونِ يَتَأْوِلِ الْأَلْبَابِ

-আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোক্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়।^৩

এখানে এ কথাটি মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কোনো সমস্যার গভীরে দৃষ্টি রাখেন। তাই তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভব নয় যে, মানবজাতি অজ্ঞতাবশত যে সব ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড সমাজে জন্ম দিয়েছে তা তিনি বহাল রাখবেন। তাই হজু গমনকারীকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন স্বীয় পাথেয় ও যাবতীয় রসদপাতি সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তারপর বললেন, তোমাদের সর্বোক্তম পাথেয় তো হল তাকওয়া, আর অন্যান্য আসবাবপত্র হল দ্বিতীয় পর্যায়ের।

তদুপরি হজুপালনকারীর সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা ব্যবসা করাকেও হালাল করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন-

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مَّنْ رَّبِّكُمْ

-তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অব্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।^৪

ব্যবসা ও বেচাকেনাকে আল্লাহর ‘ফযল’ ও অনুগ্রহ আখ্যা দিয়ে এবং তার বিশেষ অনুমতি প্রদান করে সে সব লোকদের জন্য হজুর সফরকে সহজ করে দিলেন যারা পুরো পাথেয় নিয়ে যেতে আর্থিক দিক দিয়ে সর্বাবস্থায় সক্ষম নয়। বস্তুতঃ এটি আল্লাহ রাকবুল ইজ্জতের কতই না দয়া ও রহমত যে, তিনি সে সব লোকদেরকেও হজু আদায়ের সুযোগ করে দিলেন যারা আর্থিকভাবে পুরো সচ্ছল নয়, তবে হজুর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে হজুর খরচটা মিটাতে সক্ষমতা রাখে।

উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলাম জাহিলিয়াতের সেসব অনাচার, ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারকে ধূলিসাং করেছে, যা বহুকাল ধরে তারা হজুর ইবাদতের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলো। ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমতা ও ইনসাফ বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তাই তার স্বভাবত কর্মপদ্ধতি (Liberal Approach) অনুযায়ী হজুকে Institution তথা একটি বিধান হিসাবে অর্থনৈতিক বাধা-বিঘ্ন (Economic Constraints) থেকে পৰিত্ব করে

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৮

^২. মুসলিম : আস সহীহ, খুল্লে খুল্লে হজু আল্লাহর পাদ পর্যায়ে ৬/২৪৫, হাদীস : ২১৩৭

^৩. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৭

^৪. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৮

দিয়েছে। ফলে হজুর যাবতীয় ইবাদতসমূহকে এমন সহজসাধ্য ও অনায়াসলক্ষ করে দিয়েছে যাতে সমাজের শ্রেণী-বৈষম্য ব্যাতিরেকে প্রত্যেক স্তরের পক্ষে হজুর ব্যবহার যোগাড় করা সম্ভব হয়।

হজু ও জাহিলি যুগের শ্রেণীবিভেদ

হজুর ইবাদতে যখন ইবরাহীম দ্বীন ও সুন্নাত সপ্রাণ বাকি থাকলো না তখন জাহিলিয়াতের আরবে গোত্রীয় অহংকার, আত্মগৌরব ও দাঙ্কিকতাবশত পুঁজিবাদি মনোভাব বিস্তার হওয়াটাই স্বাভাবিক, যার ফলে আরবসমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি সম্পদশালী শ্রেণী আর অপরটি হল নিঃস্ব ও সম্বলহীন শ্রেণী। সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের প্রভাব হজুর ওপর গিয়ে পড়ল- আমীর-ওমারা ও ধনী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র মুয়দালিফা পর্যন্ত গিয়ে হজু সমাপ্ত করবে আর নিম্নবিভিন্ন ও গরীব লোকদের মুয়দালিফার পর আরাফাত পর্যন্ত যাওয়া জরুরি, এটাই তাদের স্ব-উভাবিত হজু। ইসলাম আগমন করে তাদের এই বৈষম্য খতম করে দিল এবং হজুকে সঠিক অর্থে ইসলামি সাম্য ও সমতার বাস্তব দৃষ্টান্ত করে দাঁড় করাল। অতঃপর সুন্নাতে ইবরাহীমি ও ইসমাইলি মতে প্রত্যেক হাজীর উপর জরুরি হয়ে পড়লো যে, জিলহজুর নবম তারিখ মিনা থেকে রওয়ানা দিয়ে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়া, সেখান থেকে সেদিন সন্ধ্যায় মুয়দালিফায় গিয়ে অবস্থান করা, তারপর মিনা গিয়ে কুরবানী দেওয়া। এতে করে হজুর দিনগুলিতে আইয়ামে তাশ্রীকের যে একটি তারতীব ছিল যা জাহিলিয়াতের যুগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা আবার পুনরুজ্জীবিত হল। আর এর মাধ্যমে জাতিগত শ্রেণী বৈষম্য ও বিভেদের যে প্রথাটি চালু ছিল ইসলামের সাম্যের শিক্ষায় তা চিরতরে নস্যাং হয়ে গেল।

গোত্রীয় অহংকার ও আত্মভূরিতার বিলুপ্তি

ইসলাম-পূর্ব মূর্খতার যুগে আরো একটি কুপ্রথা চালু ছিলো যে, তারা হজু থেকে ফেরার পথে মিনাতে মেলার আয়োজন করত। সেখানে তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব প্রকাশ করার স্থলে প্রকাশ্যে স্বগোত্রীয় অহঙ্কার ও গৌরব প্রকাশ করতো। বাপ-দাদার কর্মকীর্তি ও অবদান তুলে ধরে চরম বাঢ়াবাড়িতে লিখ হতো আর বিপক্ষের দুর্নাম করে তাদের অপদষ্ট করা হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর সেসব গোত্রীয় অহঙ্কার-প্রতিযোগিতার পরিবেশেই নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হল। কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা উপদেশমূলক বক্তব্য দ্বারা তাদের এই গোত্রীয় দণ্ড প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। ইরশাদ হল-

فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُمْ إِبَاءَكْمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

-তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে; বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে।^১

অতঃপর ইসলাম হজুর পরিবেশকে কলুষমুক্ত করল, আরব্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেলার পরিবর্তে তাতে সৃষ্টি হল স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা। এর ফলে লোকেরা তাদের বাপ-দাদার গৌরব ও বড়ত্ব এবং বিপক্ষের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও দুর্নাম প্রকাশের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও গরিমার কথা ব্যক্ত করতে লাগলো, খুশু-খুয়ু তথা পূর্ণ বিনয় ও ন্যূনতায় ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল।

হজু থেকে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও কুপ্রথা বিনাশের ঘোষণা কুসংস্কার পীড়িত জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা কাবার তাওয়াফ করত নগ্ন হয়ে, তালি বাজিয়ে ও শিস্ ফুটিয়ে। ওগুলোকে তারা ইবাদত মনে করতো। পবিত্র কুরআন মজিদ তাদের এই অশুভ আচরণকে এভাবে বর্ণনা করে-

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِيرَةً

-আর কাবার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না।^২

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ওইসব ভাস্তু, বাজে ও ভিত্তিহীন প্রথাসহ জাহিলিয়াতের সমূহ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে দিলেন।

ইতিহাস পর্যালোচনায় হজুর প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করলে যে হজুটি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তা সেই হজুর উন্নত চিত্র যা হ্যরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে হিজরী নবম সনে আদায় করা হয়। স্মরণ থাকা চাই যে, মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরিতে। সে বছর সেই প্রাচীন রীতি মতে হজ আদায় করা হয় যা যুগ যুগ ধরে জাহিলিয়াতে বিদ্যমান ছিলো।

পরের বছর নবম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাফেলা আমীর করে শীর্ষ সাহাবাদের নিয়ে মক্কায় প্রেরণ করলেন। কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো, ইতিমধ্যে সূরা

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২০০

^২. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৩৫

তাওবার কতিপয় আয়াত নাফিল হল, যাতে বিস্তারিতরূপে হজুর আহকাম বর্ণিত হয়েছে এবং জাহেলি যুগের সেসব বাতিল প্রথা ও কুসংস্কারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার আগ্রাসনে হজুর আসল চিত্রই সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মকায় পাঠালেন এবং হজু সম্পর্কিত এসব আয়াতসমূহকে সমবেত হাজুদের মাঝে খুতবা আকারে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিলেন। তখন হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মতো সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছানোর জন্যে হ্যরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাফেলায় শরীক হলেন আর হজুর বিশাল সামাবেশে খুতবা পেশ করলেন। তখন থেকে অঙ্ককার যুগের সকল কুসংস্কারকে চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হল। ইতিহাসের পাতায় এ-কথা সংরক্ষিত আছে যে, নবম হিজরীতে হজু দু'নিয়মে পালন করা হয়। কাফের মুশরিকরা তাদের পিত্তপুরুষদের প্রাচীন নিয়মে হজু-প্রথা সম্পাদন করল আর মুসলমানগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুনির্ধারিত নির্দেশ মতে হজুর ইবাদত আদায় করল। তারপর এই ঐতিহাসিক হজু নববী ইরশাদ শুনিয়ে দেওয়া হল যে, আগামী বৎসর হতে পবিত্র হারামে আল্লাহর ঘরে আর কোনো মুশরিকের হজু করার অনুমতি নেই। অতঃপর আগামী হজুর আগে আগেই মক্কা ভূমি সকল কাফির ও মুশরিকদের থেকে চিরদিনের জন্য পবিত্র হয়ে গেলো। এভাবে সকল কুসংস্কার ও তাগুতি প্রথাসমূহের সঙ্গে হজুর আর কোনো সম্পর্ক রইল না।

বিদায় হজুর খুতবার শুরুত্ব ও অনন্যতা

পরের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সাহাবাদের নিয়ে হজু গমন করলেন। তখন উপস্থিত বিশাল জনসমূহে তিনি যে ভাষণটি প্রদান করেছিলেন তাকে ইতিহাসে ‘বিদায় হজুর খুতবা’ নামে অভিহিত করা হয়। ওই অসাধারণ স্মরণীয় খুতবাকে যথাযথ অর্থে ‘মানবাধিকার সনদ’ (Human Rights Charter) বলা হয়। ওই খুতবার প্রতিটি শব্দ অপূর্ব বিশুদ্ধ, মধুর, ভাষালঞ্চারে সজ্জিত ও সর্বোচ্চ সাহিত্যপূর্ণ ছিল। এই ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোত্রীয় অহঙ্কার, সামাজিক ভেদাভেদের বাতিল ধারণা এবং আরব-আজমের মিথ্যা বিশিষ্টতা ও পার্থিব যশ-খ্যাতি ও গেঁড়ামির উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী বিভেদের অবাস্তব খেয়ালিপনাকে নিঃশেষ করে দিলেন আর কঠোরভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, অনারবের উপর আরবের কোনো ফয়েলত নেই, কৃত্বাদের উপর কোনো শ্বেতাসের শ্বেষ্টত্ব নেই। যদি কোথাও কারো ফয়েলত

থাকে তা কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতেই নির্ণিত। ওই ঘোষণায় (Declaration) একথাটি স্পষ্টাকারে ও জোরালোভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের জানমাল, রক্ত ও ইজত-আবরু এতই সম্মানের অধিকারী যেমন আজকের এই দিন ও এই শহর।

এমনিতো বিদায় হজুর পুরো ভাষণটি স্বর্ণক্ষরে লিখে রাখার মতো। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে মাত্র দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে-

كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الرَّجَاهِ لَيْسَ بِحَقٍّ قَدْمَيْ.

-জাহিলিয়াতের সকল কুসংস্কার আমার পদতলে।^১

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ

-এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ক আছে।^২

এই ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদের ব্যাপারে বিপুরী ঘোষণা দিয়েছেন, যার সূচনা করেছেন আপন চাচা হ্যরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবশ্য-পরিশোধযোগ্য সূদ রহিত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে। এভাবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সূচনা নিজের ঘর থেকে করে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, আমার চাচাকে যে ব্যক্তি ঝণ ফেরত দিতে চায় সে যেন মূলধনই দেয়, তার সমস্ত সূদ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। এটাই সত্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সার্বজনীন ‘ইনকিলাবী তালিম’ রাজনীতি, অর্থনীতি, নৈতিকতা, মোটকথা জীবনের সকল অঙ্গে ও সমস্ত শাখা প্রশাখায় গভীর, সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর প্রভাব ফেলেছে। আজ চৌদ্দ শতাব্দী পার হয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কালজয়ী বক্তব্য থেকে সাম্য ও সুবিচারের এমন সব বিধান ও নীতি উদ্ধার করা যায় যা সম্পূর্ণরূপে মানবাধিকারের জামানত দিতে পারে। যার উপর ভিত্তি করে পরম্পর যুদ্ধ-বিধি, হিংসা-প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ রচনা করা যায়।

নববী শিক্ষার একটি মৌলিক অংশ যা প্রতিষ্ঠা করা আগের তুলনায় আজ বড় প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। তা হল, মানুষের রক্তের মর্যাদা ও সম্মান। সুনানে ‘মাজাহ’র রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ

^১. মুসলিম : আস সহীহ, حَدَّثَنَا أَبْدُو بْنُ ৬/২৪৫, হাদীস : ২১৩৭

^২. বৃথারী : আস সহীহ, ১/৬

করার সময় কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলেন, অতঃপর কা'বা শরীফকে লক্ষ করে বললেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ.

-কসম ওই সত্ত্বার, যার হন্তে মুহাম্মদের প্রাণ একজন ঈমানদারের মান-
মর্যাদা আল্লাহর নিকট তোমার চেয়ে বেশী।’

ଆধ্যাত্মিক কবি মাওলানা রূমী এই বিষয়ের ব্যাখ্যা কতো সুন্দর করে দিয়েছেন-

دل بدست آور که حج اکبر است ☆ از هزاراں کعبہ یک دل بهتر است

-'হৃদয়কে সন্তুষ্ট রাখ । এটা হল বড় হজু । আর হাজারো কা'বার চেয়ে
একটি হৃদয় উত্তম ।'

আফসোস! আমরা নববী শিক্ষা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছি। আমাদের জীবন কতো যে বৈপরিত্যবহুল, আমরা ক'বার সম্মানার্থে কিবলার দিকে থুথু ফেলিনা, আর অন্য দিকে মানুষের মান-মর্যাদা ও জান-মালের ক্ষম্ব কোনো তোয়াক্তাই করিনা! আসুন, আমরা নিজেদের আমলের ঝুলির দিকে তাকাই আর ভেবে দেখি, আমাদের কর্ম-পদ্ধতি মুনাফিকের কর্ম-পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ করে কি না।

তৃতীয় অধ্যায়

হজু হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কেন্দ্রীয় ভূমিকা কেন?

বিগত অধ্যায়ে হজ্জের ইতিহাস অনুসন্ধান করে ইসলাম পূর্ব যুগে হজ্জে ইবাদতের নামে যেসব কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ আরবের জাহেলি সমাজে শিকড় গেড়ে গিয়েছিল তা আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। যখন ইসলাম বিজয়ী হল, বাতিল পরাজয় বরণ করল তখন সকল ভ্রান্তপ্রথা ও কুসংস্কারের চিরপতন হল এবং হারামের পবিত্র ভূমিকে কুফর-শিরকসহ যাবতীয় নাপাক ও পক্ষিলতা থেকে পবিত্র করে দেওয়া হল। আর ‘শাআউরুল্লাহ’ তথা আল্লাহর নির্দর্শনের মর্যাদা প্রদর্শনের নামই হজ্জ বলে বিবেচিত হল।

এখন আমরা হজু পালনীয় মানসিক, আরকান এবং ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদিতে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখেন তার সকল দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করবো।

অনশ্বীকার্য কথা যে, হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর সকল ধর্মে
কেন্দ্রীয় ও বুনিয়াদি গুরুত্ব বহন করেন। আমরা এখানে ওই সব কারণ-উপকরণ
ও মৌলিক ভিত্তিসমূহের আলোচনা করবো যা হজ্জের ব্যাপারে হ্যরত ইবরাহীম
আলাইহিস সালামকে মূলকেন্দ্র বলে সাব্যস্ত করে।

ପ୍ରଥମ କାରଣ

বর্ণিত অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে যে, বর্তমান মানব ইতিহাস আনুমানিক যা সাড়ে চারহাজার বছরের পুরানো; তার সূচনা হয়েছে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে। তার পূর্বের সকল ঘটনাপঞ্জি রেকর্ড করা হয়নি বিধায় তা ইতিহাসপূর্ব যুগ বলে অভিহিত। হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম হতে নিয়ে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সময়কালের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের সূত্র একমাত্র আসমানী কিতাব ও সহীফা ছাড়া আর কিছুই নাই। তারপরও জানা থাকা জরুরি যে, সে সব সূত্রসমূহের মধ্যে ইঞ্জিল ও তাওরাতও আছে যা খুস্টান ও ইয়াত্তুদীদের কাছে আসমানী কিতাব বলে সম্মানের অধিকার রাখে। তবে বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কারণে তা অতিশয় সংশয়পূর্ণ ও বিতর্কিত হয়ে গেছে। তাতে এমন সব বৈপরিত্য আছে যে, সেখান থেকে কোনো ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সুকঠিন। একারণে এখন আমাদের কাছে প্রাচীন ঘটনাপঞ্জি যাচাই-বাচাই করাব একমাত্র সূত্র হচ্ছে কুরআন মজিদ এবং হাদিস

শরীফ। আর যেহেতু ইতিহাসবেগুদের দৃষ্টিতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের পূর্বেকার ঘটনাসমূহ অজানার যবনিকার আড়ালে রূপ্ত তাই তাদের দৃষ্টি হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরের ইতিহাসের দিকে, এতে করে আমরা একথা বলার অধিকার রাখি যে, বর্তমান বিশ্বের ইতিহাসে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-ই সর্বস্বীকৃত কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ও বুনিয়াদি ভূমিকা বহনকারী। তাঁর পূর্বের যুগ ইতিহাসের দিক দিয়ে অজানার আবরণে ঢাকা পড়ে আছে।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় মূল কারণ যা হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রদানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল তাঁর আম্বিয়ায়ে কিরামের দাদা হওয়ার স্বীকৃত বাস্তবতা। বিবিধ ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় যে, হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একপুত্র হয়রত ইসহাক আলাইহিস সালাম ছিলেন যাঁর ওরসে হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ঠ হন। হয়রত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তান, যাঁর কাহিনী কুরআনে মজিদে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পর থেকে হয়রত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত পয়গাম্বর হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হওয়ার সম্মান বহন করেন। হয়রত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপাধি ‘ইসরাইল’ যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। সে হিসেবে তাঁর বংশধর বনী ইসরাইল হিসেবে পরিচিত। বনী ইসরাইলে ধারাবাহিকভাবে বহু আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হয়েছেন। হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় সন্তান হলেন হয়রত ইসমাইল আলাইহিস সালাম। তাঁর বংশ থেকে শ্রেষ্ঠ ও শেষনবী হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কাউকে নবুওয়াতের স্বর্ণসনে আসীন করা হয়নি।

তৃতীয় কারণ

হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনন্য ভূমিকার তৃতীয় মৌলিক কারণ হল, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত দাদা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আমার পিতা ইবরাহীম’ বলে গর্ববোধ করতেন এবং তিনি নবী হওয়াকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া ও সু-সংবাদের ফসল বলে মনে করতেন। কুরআন মজিদে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওই সব দোয়া উদ্বৃত হয়েছে যা তিনি হয়রত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সাহায্যে কাঁবা শরীফ নির্মাণের সময় করেছিলেন। তাঁর সে দোয়া কবুল হওয়াতে কার আপত্তি থাকতে পারে? তমধে একটি দোয়া হল-

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِذَا تَبَّأْتَكَ وَيُعَلِّمُهُمْ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيْرُ الْحَكِيمُ

-হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিচয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।^১

এসব দোয়াতে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখা যায় তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছেন যে, বারে এলাহী! আমার বংশ থেকে এমন সন্তান প্রেরণ করুন যারা তোমার ইবাদত-বন্দেগীতে দিন-রাত মশগুল থাকে। অবশ্যে স্থীয় আশাজাগানিয়া ও ভাগ্যবান পুত্র হয়রত ইসমাইল আলাইহিস সালামের সহায়তায় কাঁবা নির্মাণের মুহূর্তে এই দোয়া তাঁর মুখে অনায়াসে এসে গেলো যে, এলাহী! এই পুত্রের ওরসে সেই শেষ নবী প্রেরণ করো যার অস্তিত্ব সুবাদে পৃথিবীর অস্তিত্ব হয় এবং যার শিরে রাহমাতুল্লিল আলামীনের মুকুট অনন্তকাল ধরে রাখা হয়।

হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঈমানে ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা ছিলো, ছিলো ইয়াকীন, তাই সে সব দোয়া যা আল্লাহর ঘর কাঁবা নির্মাণের প্রাক্কালে করা হয়েছিলো তার করুলিয়াত লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কতো বিস্ময়ের কথা যে, হয়রত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে বনী ইসরাইলের অসংখ্য পয়গাম্বর নিজেদের কাওমকে হিদায়াতের বাণী পৌছানোর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন এবং তার ধারাবাহিকতা হয়রত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত এসে বন্ধ হয়ে যায়, আর হয়রত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে শুধুমাত্র সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হল এবং তাঁর দ্বারা নবুওয়াতের ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফসল সেহেতু সেই মহান নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সে সব স্মৃতি যা তার দিকে মানসূব ও সম্মোধিত হয় হজ্জের আরকান ও মানাসিকে স্থান করে দেওয়া হয়। এভাবে পুরো হজ্জ সেই মহান ইহসানের কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়ার নাম যা আল্লাহর দরবারে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া কবুল হওয়ার অবয়বে সমগ্র মানবজাতির উপর করা হয়েছে। তাই বলা যায়, হজ্জের মানাসিক ও

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৯

ইবাদতসমূহ যেন হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্পৃক্ষ সেই সব স্মৃতিবিজড়িত কর্মসমূহ যা হারমের পবিত্র ভূমিতে চিরভাস্তর হয়ে আছে, হজু আদায়ের মাধ্যমে সেসব স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা সমগ্র বিশ্বের মুসলিমের উপর ফরয করে দেওয়া হয়েছে আর কিয়ামত অবধি এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

চতুর্থ কারণ

হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নববী ব্যক্তিত্বের অনন্যতার চতুর্থ কারণ হল, নবুওয়াতের দায়িত্বের কারণে তাঁকে সমূহ পরীক্ষা ও বিপদের মুখ্যমুখ্য হতে হয়েছে। একথা বিদিত যে, দায়িত্ব যত বড় হবে পরীক্ষাও ততো কঠিন হবে। সে হিসেবে এ মহান ব্যক্তিত্বকে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যেহেতু হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা হওয়ার অভূতপূর্ব সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন তেমনি তাঁকে অপূর্ব পয়গাম্বরী যোগ্যতা, মেধা, ধীশক্তি ও নেতৃত্বও দান করা হয়েছে।

তাঁর অনন্য মর্যাদার কারণ এটিও যে তিনি নিজেই একাকি শিরক ও কুফরের অপশঙ্কির বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন। এরই ভিত্তিতে তিনি সেই দ্বিজাতিত্বের প্রথম প্রবক্তা ও প্রধান ব্যক্তি যা পাঁচ সহস্র বছর পরে পাকিস্তান সৃষ্টির মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা যায়। তদুপরি হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আজ থেকে চারহাজার বৎসর পূর্বে নজীরবিহীন প্রত্যয় ও স্বীয় মাকসাদের ইশ্কের টানে বাতিলের মোকাবিলায় হৃকুমাতে ইলাহিয়ার রূপরেখার ঝাণা উত্তোলন করেছেন এবং তাগুতি অপশঙ্কিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নমরাদের প্রজ্ঞালিত অগ্নিকুণ্ডে নির্ভয়ে ও নির্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আল্লামা ইকবাল মরহুমের ভাষায়-

بِخَطْرِ كُوْدَرْ آتِشْ نَرْدِدْ مِنْ عَشْ عَلَى مُوتَمَّثِ لَبْ بَامْ بَهْ
—নির্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রেম নমরাদের আগুণে, আকল তো এই
তামাশা দেখে অস্থির, সে এটা বুঁৰে ওঠে কোন গুণে।'

ঠিক এই চিন্তা ও ধারণা ইসলামের সর্বশেষ নবী হয়েরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাধনা ও মেহনতের মূলে কার্যকর ছিলো, যার উপর ভর করে ইসলামের আজীমুশ্শান ‘প্রাসাদ’ নির্মিত হল। দেখতে দেখতে আরবের মরক্কাসীরা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সকল প্রতাপ মাটিতে মিশিয়ে দিল এবং পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রথমবার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা ও গোড়াপত্তনও সেই দ্বিজাতিত্বের অবদান। উপমহাদেশের মুসলমানগণ কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিনাহর নেতৃত্বে ইসলামী চেতনার

পতাকা নিয়ে দাঁড়ালো আর দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের মানচিত্রে অমর বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ করে পাকিস্তান নামের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অভূত্যদয় হল।

কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ উপমা ও আদর্শ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।
ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةٍ

-তোমাদের দিকনির্দেশনার জন্য রাসূলের জীবনে উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে।^১

একথা জেনে রাখা উচিত যে, কুরআন মজিদ শুধু দু'ব্যক্তির কথাই বলেছে যাঁদের জীবন ও চরিত্র বিশ্বমানবমণ্ডলীর জন্য পূর্ণ আদর্শ হতে পারে। তমধ্যে প্রথম জন হলেন হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আর দ্বিতীয় জন হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই দুই মহান ব্যক্তি হিদায়তের সেই আলোকবর্তিকা যাঁদের উত্তম আদর্শ থেকে আলো গ্রহণ করার জন্য পুরো বিশ্বজাহান চিরকাল মুহতাজ ও উন্নুখ হয়ে থাকবে। নিঃসন্দেহে হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দ্বীন-এ- হানীফ তথা ইসলামের প্রথম দাঙ্গি আর এই ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হয়ে মানবজাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়তের আলো বিকিরণের জন্য বিশ্বজাহানে প্রেরিত হয়েছেন।

নিঃসন্দেহে হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জীবনও সকল ঈমানদারের জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তিনি ওই মুহূর্তে তাওহীদের ঝাণা উত্তোলন করলেন যখন সমগ্র কাফের জগত মৌখিক ও স্ন্দীয় সীমিত ধারণার বাইরে আর কোনো ধারণাকে মেনে নিতে পারছে না। তিনি তখন স্ব-উদ্ভাবিত খোদার পরিবর্তে একমাত্র রব মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনার ডাক দিলেন এবং তাওহীদের চেতনায় সকল গোড়ামি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানালেন। কুরআন মজিদের ভাষায় তিনি তাদের এই সাধারণ ঘোষণা দিলেন-

قَالَ بَلْ رَبِّنَا رَبُّ الْجَنَّاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُ
وَأَنَّا

عَلَى ذَلِكَمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ

^১. আল-কুরআন, সূরা আহ্যাব, আয়াত : ২১

-তিনি বললেন, না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা।^১

তাওহীদী দৃষ্টিভঙ্গই ঐক্যের ভিত্তি

হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর অতরে কোনো প্রকার বাতিলের সঙ্গে আপোষের চিন্তাকে স্থানই দেন নি; বরং কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতির বর্তমান সন্ত্বেও তিনি তাওহীদ ও একত্বাদের ঝাঙা তুলে ধরেছিলেন। তিনি পৌরুলিক জাতির সঙ্গে বৈরিতা প্রকাশ করতঃ বজ্রকচ্ছে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, কাফির জগতের সঙ্গে তাওহীদের দৃষ্টিকোণ ব্যতিত অন্য কোনো পথে তাঁর পক্ষে ঐক্য সম্ভব নয়। ঈমান ও কুফরের পথ এক নয়, উভয়ের গন্তব্যও অভিন্ন নয়। দু'টোর জীবন দর্শনের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। অতএব হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর কর্মপদ্ধতি দ্বারা একথা প্রমাণিত করেছেন যে, তাওহীদ ও একত্বাদের বিশ্বাসে যে জাতীয়তার জন্ম হয় তা দেশাত্ম, ঈন্দ্রীয় ও রঞ্জ-বংশের চিন্তা-চেতনার বহু উর্ধ্বে। এটিই ইসলাম যার দাবি হল এক খোদার উপর বিশ্বাস এবং তাঁর সকল নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা।

চতুর্থ অধ্যায়

হজুর মানাসিকের তাৎপর্য

বিগত অধ্যায়ে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে তিনি একটি বিশাল সংখ্যক পয়গাম্বরের দাদা হওয়াটা একটি মৌলিক বিষয় ছিলো। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় সেসব আরকান ও মূল বিষয়াবলি যা আদায় করলেই একটি পূর্ণাঙ্গ হজু আদায় হয়।

শা'আইরুল্লাহ (আল্লাহর নির্দর্শনাবলি) কী?

হজুর সকল মানাসিক ও আরকান তথা মৌলিক বিষয়াদি শা'আইরুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শাব্দিক দিক দিয়ে 'শা'আইর' এটি আরবি 'শি'আর' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ চিহ্ন, প্রতীক, নির্দশন। কুরআন মজীদে তার কাছাকাছি শব্দ 'আয়াত' (যা 'আয়াতুন' এর বহুবচন) ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইসলামে ওই সব আরকান চাই তা ইবাদত কিংবা আদেশ-নিষেধ সম্পর্কীয় কোনো বিষয় হোক এবং যাতে আমল করলে ইসলামের একটি সমষ্টিগত রূপরেখা ভেসে উঠে তা শা'আইর এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু সেসব বস্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত যাদের সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে তাআলুক রয়েছে সেহেতু এই সব প্রতীক ও নির্দশনসমূহকে শা'আইরুল্লাহ বলা হয়। সেসবের মধ্যে ওই নিসবতগুলোও শামিল হয়ে যায় যা আল্লাহর মনোনীত নবী ও মকবুল নেক-বান্দাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং যাদের তাআলুক আল্লাহর সঙ্গে একান্ত নৈকট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

শা'আইরুল্লাহ এর উপরোক্ত অর্থ নেওয়া হলে তখন ওই সব আনুষঙ্গিক বস্তুও যা আল্লাহ তাআলা নিজের কোনো বান্দাকে তার বিশেষ আমলের দরূণ অতি প্রিয় করে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ প্রিয়ত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়— এ-সবই শা'আইরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সেই স্থানে গিয়ে ওগুলোর সম্মান জানানোকে আজীবনের জন্য ইবাদতের অংশ বিশেষ করে দেওয়া হল। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ شَعْتِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

-এটা শ্রবণযোগ্য- কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহভীতি প্রসূত।^১

এই আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলির সম্মান প্রদর্শনকারীর অন্তর তাকওয়া তথা খোদাভীতির দ্বিষ্ঠিতে উদ্ভাসিত হয়। কত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, ইবাদতের এই সুউচ্চ মকাম যা অন্তরের পবিত্রতা ও পরহেজগারির কারণ হয় বান্দাকে শুধুমাত্র শা'আঙ্গুরল্লাহর সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা নসীব হয়ে যায়। এতে করে একথাও সুপ্রমাণিত হল যে, আল্লাহ রাকুনুল আলামীনের নিকট আপনজনদের 'কাজগুলো' কতো ভালো লাগে!

শা'আঙ্গুরল্লাহ ও ইশ্কের দাবি

উপরে সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে যে, হজ্জের সকল আরকান ও মানাসিক শা'আঙ্গুরল্লাহর আওতাভুক্ত। ওইসব বস্তুর সম্মান প্রদর্শনের হেতু ও গৃঢ় তত্ত্ব মানুষের আকল-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। কেননা এই সব হল ইশ্ক-প্রেম সম্পর্কিত বিষয়, যা আকল-বুদ্ধির মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক তো বস্তুর ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক দিক বিবেচনা করে থাকে এবং বস্তুর বাহ্যিক অবস্থানি ও পরম্পরাক সম্পূরক বিষয়াদি আত্মস্থ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে ফায়সালা দেয় যে, অমুক বস্তু সম্মানের উপযোগী কি না। তদুপরি কোনো বিষয় আকল-বুদ্ধির মাপকাঠিতে যদি তোলা না যায় তবে তো তাকে কোনো প্রকার উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে মনে করাই হয় না। পক্ষান্তরে ইশ্ক ও মুহাব্বত বস্তুগত ও বিবেকগত চিন্তা-গবেষণার উর্ধ্বে গিয়ে নিসবত ও সম্পর্ককেই তাজীম ও সম্মান প্রদর্শনের কারণ জ্ঞান করে। তাতে লাভ লোকসানের কোনো ধারণা ও ভাবনা কার্যকর হয় না। চিন্তা-বুদ্ধি ও যুক্তি-জ্ঞানের নিরিখে প্রদত্ত ফায়সালার কোনো প্রকার বাস্তবতা নেই। এ কারণে একথা বলা অসঙ্গত ও অবাস্তব হবে না যে, শা'আঙ্গুরল্লাহর সম্মান জানানোর দর্শনগত দাবি ইশ্ক ও প্রেম চূড়ান্ত সাধনকল্পে নির্দিষ্ট আহকামে ইলাহীয়া পালনের নির্দেশ করে। তাতে বস্তুগত বিচার-বিশ্লেষণের কোনো সুযোগ নেই; বরং সেখানে আল্লাহর চাওয়া-পাওয়ার নিমিত্তেই সকল প্রেমনিবেদন ও আত্মত্যাগের অপূর্ব কর্ম্যজ্ঞ চলবে।

হজু সম্পর্কে কুরআনি নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে হজ্জের আহকাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

لَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَأً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِّعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ

^১. আল-কুরআন, সূরা হজু, আয়াত : ৩২

-প্রত্যেক জাতির জন্য আমি ইবাদতের নিয়ম-নীতি তৈরী করেছি, যাতে তারা ওই মতে চলে, সুতরাং নিশ্চয় ওই সব লোক আপনার সাথে যেন এ ব্যাপারে ঝগড়া না করে।।^২

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَتَأْوِلُ إِلَيْكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ

-হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।^২

দ্বিতীয় আয়াতে 'কিসাস (قصاص)' শব্দটি স্বীয় পারিভাষিক অর্থ 'রক্তবিনিময়'-এ ব্যবহৃত হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে তার অর্থনীতিত ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার আলোকে জীবনের বিনিময়ে জীবন নয়রানা পেশ করার কথা বলা হয়েছে। কুরআন মজিদ অত্যন্ত সারগর্ড ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আন্দায়ে ব্যাখ্যা করে তুলে ধরেছে যে, প্রাণ বিসর্জন ও মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করার মধ্যেই যিন্দেগীর গুপ্তরহস্য নিহিত, যদিও জীবনের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যিক এই নয়রানার কোনো বুদ্ধিগত রহস্য উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। তারপরও ইশ্কের মুফতি সে ব্যাপারে ফতওয়া দেয় যা ইকবাল মরহুমের ভাষায়-

بے خطر کو در پر آتش نمرود میں عشق ☆ عقل ہے کوتائیے بامی

-নির্দিষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রেম নামরান্দের আগুণে। আকল তো এই তামাশা দেখে অস্ত্র, সে এটা বুঝে ওঠে কোন গুণে।

ইশ্ক ফলাফলের দিকে তাকায় না, সে তো প্রেমাঙ্গদের ইশারায় আত্মোৎসর্গ করতে এবং নির্দিষ্টায় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ করে। সে তো মাহবূবের সন্তুষ্টির জন্যে সর্বদা চিন্তিত, তাই আকল-বুদ্ধির ন্যায় সে লাভ-লোকসানের পেছনে পড়ে না। আর তার কাছে প্রেমাঙ্গদের সন্তার নিসবতে যা কিছু আছে তা যেন প্রাণের চেয়ে প্রিয়। অথচ আকল বস্তুগত লাভ-ক্ষতি ও মন্দামন্দের প্রবাহে পড়ে হারিয়ে যায় এবং পরিস্থিতির বিচারকার্যে সকল ফায়সালা সুবিধা ও স্বার্থের আওতায় করে। বস্তুতঃ ইশ্ক ও বুদ্ধির গতিবিধি এবং উভয়ের চিন্তাধারা ভিন্ন। পৃথক পৃথক অবস্থান থেকে তারা বিবিধ বিষয়ের তত্ত্ব ও ফলাফল নির্ণয় করে থাকে।

^১. আল-কুরআন, সূরা হজু, আয়াত : ৬৭

^২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৭৯

এরই ভিত্তিতে ইসলামে প্রবেশ করার পর ঈমানের দাবিই হল বুদ্ধিগত ও দর্শনগত কোনো বিবেচনা না করে অদৃশ্যেই মেনে নেওয়া। ঈমান বিল্ক গায়বের এই মর্মকেই আল্লাহ তাআলা ব্যক্ত করেন-

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

-কুরআন ঐসব মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়ত, যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে।^১

আয়াতটিতে অতি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হিদায়ত শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা তাকওয়া, খোদাভীতি এবং অদৃশ্যলোকের সকল বস্তুতে ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করবে। অর্থাৎ হিদায়তের মন্যিলে আকল ও বিবেক-বুদ্ধির পথে পৌছা যায় না, পৌছা যায় কেবল ইশ্ক, প্রেম ও দিওয়ানা হয়ে আত্মাসর্গের পথে। এটিই কুরবানীর রহস্যেরও সারমর্ম, যা বান্দাকে সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতি উদ্বৃদ্ধ করে।

কুরআন মজিদের ইরশাদ- ‘তিনি প্রতিটি জাতির জীবন ও অস্তিত্বের জন্যে কোরবানীর শর্ত আরোপ করেছেন’ এই বাস্তবতাকেই ফুটিয়ে তোলে। অনন্ত জীবনের মান্যিল মৃত্যুর রাজপথ দিয়েই অর্জন হয়- বিবেক-বুদ্ধি এই তত্ত্ব বুঝার শক্তি রাখেনা, সে সম্মুখে মৃত্যু দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। অথচ ইশ্কের উন্নাদ-পদ সেদিকে কদম বাঢ়িয়ে এগিয়ে যায় আর মাহবূবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

নবী মুস্তফার সামনে বিবেককে নতজানু কর

আজকের ফেতনার যুগে যখন তাগুতি শক্তিরা উম্মতে মুসলিমার চতুর্দিকে আগ্রাসন চালাতে ব্যস্ত এহেন নাযুক মুহূর্তে মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ হল, উম্মাহর প্রতিটি অস্তরে ইশ্কে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়পটে এ কথা ও অনুভূতি গেঁথে দেওয়া যে, যখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের কথা বলা হবে তখন তার সম্মুখে বিবেক-বুদ্ধি ও আকলকে কোরবান করে দেওয়া এবং বিনা সঙ্কেচে মুস্তফার দরবারে মাথা নত করে দেওয়া। প্রয়োজন হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন উঠলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও যেন ইতস্তত না করে। এই সুস্পৃহা ও মৃত্যু-নেত্রের কোটরে পাগলপারা চক্ষু

রাখার সাহস ও হিমত ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না এখতিয়ার ও ইচ্ছার লাগাম সুবিধাবাদী আকলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আথের-আঞ্চাম ও ফলাফল-পরিণতি বিমুখ ইশ্কের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া না হয়। আল্লামা ইকবালকে দেখা যায় তিনি এই ইশ্ক ও প্রেমের আশা করে তাঁর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন-

خُرَقِيْهَيَانْ سِلْجَانْ كَامِلْ مَرْءَ مُولَّا بَعْجَنْ كَرْ

-বিবেকের মারপেঁচ সবকিছু আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। হে মনিব,
এবার আমাকে দান কর প্রেমের উন্নাদন।

হজু তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীদের বিশাল জনসমূহ এই কুরবানী তত্ত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যার ভিত্তি স্বহস্তে স্থাপন করেছিলেন মহান আল্লাহর দু'শীর্ষ পয়গাম্বর আজ হতে শত শতবছর পূর্বে। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিশিষ্ট থাকা সকল উম্মতকে এক মধ্যে সমবেত করে তাঁরা এই পাঠ ও সবক দিতে চেয়েছেন যে, সমগ্র বিশ্বকে শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ করতে চাইলে মুসলিম উম্মাহকে সেই কোরবানি ও ত্যাগের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে ‘এক দেহ এক মন’ হয়ে যেতে হবে। যদি মানবতার কাফেলাকে শান্তি ও নিরাপত্তার মন্যিলে পৌছা প্রয়োজন হয় তা হলে উম্মতে মুসলিমাকে সকল অর্দ্ধন্দ ও গৃহ-অনৈক্য ভুলে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে ইবরাহীমি আহ্বানে সাড়া দিয়ে বের হতে হবে, যাতে সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয় ও সর্বাত্মক ধ্বংসকে দমন করা যায়, যা সমগ্র বিশ্বাস্তিকে নিয়ে পুতুল খেলায় ব্যস্ত সকল অপশঙ্গির হাতে হচ্ছে। কা’বার পবিত্র হারম সন্দেহাতীতভাবে ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতির দৃত ও প্রতীক।

হজুর পালনীয় কাজসমূহ (মানাসিক)

আমাদের মনে ইবাদতের যে কল্পনা হজু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্যান্য ইবাদত তো বিশেষ তাসবীহ, নফল, অজিফা ও যিকির-আয়কারে সন্নিবেশিত, কিন্তু যখন আমরা হজুর জন্যে কা’বার হারমে প্রবেশ করি তখন আমাদের কাছে এ সত্যটা পরিষ্কৃট হয়ে ওঠে যে, এ তো ইবাদতের গতানুগতিক ধারণা ও প্রচলিত পথ-পন্থার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখেনা। হারম শরীফে প্রবেশ করার পূর্বে হাজী সাহেব নিজের দৈনন্দিন জীবনে পরা পোশাক সম্পূর্ণ খুলে দু’টি সেলাইবিহীন খোলা কাপড় পরে নেয় আর পাগলের মতো একটি ঘরের চতুর্পার্শে চক্রের লাগায়। তার চুলকেশ ও নখ ইত্যাদি বড় হতে থাকে কিন্তু তা কাটার অনুমতি নেই। সে তার চারিদিকের পরিবেশ থেকে অন্যমনক, অন্যদের হাল-অবস্থা থেকে উদাসীন, রক্বে-কা’বার স্মরণে তন্ত্য থাকে।

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২-৩

নবম ফিলহজু এলে বে-ইখতিয়ার সবাই দ্রুত আরাফার ময়দানের দিকে দৌড়ে যায়। আরাফার প্রাঙ্গনে পৌঁছে, যুহুর আর আছরের নামায একসঙ্গে আদায় করে। মুয়দালিফায় মাগরিবের নামাযের সময় উপনীত হয়, কিন্তু না, নামায পড়েনা; বরং ইশার জন্যে অপেক্ষা করে, তারপর ইশার নামাযের সঙ্গে একসাথে আদায় করে। মিনায় পৌঁছে মুঠিতে ক'টি পাথরকুচি নিয়ে এক কোণায় পাথরের খুঁটিকে শয়তান মনে করে তার দিকে নিক্ষেপ করে। শেষে সকল কাজকর্ম পালন করে সাফা ও মারওয়া নামক দু'টি পর্বতের মাঝখানে খুব দ্রুত দৌড়াতে থাকে।

নগ্নমন্তকে কা'বায় প্রবেশ করা এমন অবস্থায় যে, নখ-চুল বড় বড় আর তাওয়াফ মুহূর্তে পাগলের মতো তার চতুর্দিকে ঘোরা এমনসব কর্ম যার কোনো বিশ্বেষণ আকল বা বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। এসব কর্মকুশল একমাত্র ইশ্ক-প্রেম, অনুরাগ-উন্নাদনা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের দর্পণ। আকল বা বিবেক জিজ্ঞেস করে, এসব মা'মূলসমূহের বাস্তবতা কি? কিন্তু সে কোনো প্রশ্নের সত্ত্বেজনক জবাব পায় না। তবে এসব প্রশ্নের উত্তর যদি ইশ্কের কাছে তলব করা হয় তখন উত্তর মিলে যায় যে, হজুর প্রতিটি কর্মের অন্তরালে এমন মুহারিত ও প্রেমের কোনো না কোনো স্মৃতি নিহিত আছে যা কালক্রমে কোনো স্থানে বা কোনো সময়ে আল্লাহ রাকবুল আলামীনের নিকট এমন প্রিয় হয়ে গেছে যে, এখন তা ধারাবাহিকভাবে সর্বদা চালু রাখা ইবাদতের মর্যাদায় আসীন হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয় বান্দাদের আনুষঙ্গিক বিষয়াসয় এতই গুরুত্ববহুল যে, সে সবকিছুর রঙ ঢঙ ও নিয়ম-সাদৃশ্য প্রহণ করাকে অবিকল ইবাদতে স্থান দিয়েছেন। বস্তুতঃ হজু সে সব ক্রিয়াকলাপের অপর নাম যা আল্লাহর মাকবূল তথা প্রিয় বান্দাদের স্মৃতি নিয়ে কোনো না কোনোভাবে জড়িত।

হজুর মানাসিকের এই গৃঢ় তত্ত্ব ও রহস্য কুরআন মজিদের এই আয়াত থেকে প্রোজেক্টে ফুটে ওঠে-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُوْ أَعْتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَاٰ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

شَاهِيرٌ عَلِيهِ

-নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নির্দশনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজু বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই।^১

মকাবুমির মহত্বম মর্যাদার কারণ

বাহ্যদৃষ্টে জগতের মাটি পাথরে নির্মিত অন্যসব শহরের ন্যায় মক্কাও একটি শহর মাত্র। তবে দু'জাহানের সরদার সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান হওয়ার সৌভাগ্যধন্য হওয়ার কারণে অন্যান্য শহরের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব। সেই অপূর্ব সম্পর্কের দরুণ মহান আল্লাহ বলেন-

أَقِسْمُ هَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ هَذَا الْبَلَدِ

-আমি এই নগরীর শপথ করি এবং হে মাহবুব! এই নগরীতে আপনি বিদ্যমান আছেন।^২

আল্লাহর এই ইরশাদের মর্মার্থ এই যে, আমি এই অন্য শহরের কসম এ-জন্য করছি না যে, সেখানে আমার ‘গৃহ’ আছে। কসমের যোগ্য হয়েছে বরং এজন্য যে, তার সড়ক, জনপদ, অলিগলি এবং কণা-বিন্দু তোমার পদস্পর্শ পেয়েছে, যে কারণে এই শহর চন্দ্র-তারারও ঈর্ষার বিষয় হয়ে গেছে।

أَقِسْمُ لَا শব্দটি দুই অর্থবোধক। এক. যদি ‘লা’ বর্ণটিকে না-সূচক অর্থে নেওয়া যায় তা হলে আরবী ব্যাকরণগতভাবে অর্থ দাঁড়াবে এই, আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব যে আমি এই শহরের কসম না করতে পারি যেখানে ওহে প্রেমাল্পদ, আপনি অবস্থান করছেন, যার অলিগলির সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা ও গাঢ় সম্পর্ক! সেই মর্যাদাই তো কসম করার জন্য যথেষ্ট।

أَقِسْمُ لَا এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আমি এই শহরের নামে কসম করছি না। আমার কী প্রয়োজন এই শহর নিয়ে কসম করবো? সে তো তার নিজস্ব কোনো তৎপর্য বহন করেনা। তবে শুধুমাত্র এ কারণে কসম করা যায় যে, সে আপনার জন্মস্থান হওয়ার ধনে ধনী হয়ে গেছে। আর শুধু এই একটি কারণই আমার কাছে এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মহান যে অন্যান্য সব কারণ তার বিপরীতে কিছুই না।

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৮

^২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২-৩

রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় যমানাকে সমস্ত যমানা থেকে উত্তম বলেছেন, অতঃপর ওই যমানাকে যা তৎসংলগ্ন। মকানের সম্মান ও ফর্যালত যেভাবে মকানের কারণে হয়ে থাকে তদ্বপ সময় ও কাল হিসেবে ওইসব সময়ের মর্যাদা ও সম্মান সকল সময়-কালের উর্ধ্বে হবে যা রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের নিকটবর্তী। এই হিসেবেই সাহাবাদেরও সেই সম্মান অর্জিত হয়েছে পরবর্তীরা যার ধারে কাছেও যেতে পারবে না।

ভাগ্যবান সে নগরী যেখানে আছে মোর প্রেমাঙ্গদ

জগতের সেই পবিত্র ভূখণ্ড যা একটি স্থান হিসেবে বস্ত্রগত ও বাস্তবগতভাবে সম্পর্ক গড়েছে রহমতের আকর ফখ্রে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার সমকক্ষ আর কে হতে পারে? ওই নগরী যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে 'ইয়াসরিব' নামে পরিচিত ছিলো, তাঁর আগমনে মদীনাতুন্নবী হিসেবে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সেই প্রাণসঞ্চারী শহরের ফর্যালতের ব্যাপারে কার আপত্তি থাকতে পারে, যার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে অভাগা ও পাষণ্ড আমার মদীনার লোকদেরকে কষ্ট দিবে আল্লাহর কাহারী সন্তা স্বীয় গুণে তাকে এভাবে ধ্বংস করে দিবেন যেভাবে পানিতে লবণ গলে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। কথাটি হাদিসের ভাষায় নিম্নরূপ-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ سَعْدًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «لَا يَكِيدُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا اتَّمَاعَ كَمَا يَتَمَاعُ الْمَلْحُ فِي النَّاءِ».

-হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, হ্যরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন যে, মদীনাবাসীর সঙ্গে প্রতারণাকারী সেরপ ধ্বংস হয়ে যাবে যেরূপ পানিতে লবণ বিলীন হয়ে যায়।^১

মদীনা নগরীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারম বলেছেন। তার সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র কারণ নিঃসন্দেহে ওই মহৎ সম্পর্ক যা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার রয়েছে। এতে তার ব্যষ্টিক কোনো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার রয়েছে। এতে তার ব্যষ্টিক কোনো ফর্যালত ও মর্যাদার দখল নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে মদীনা মুহাব্বতকে ঈমানের অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন যার একমাত্র কারণ

প্রিয় নবীর সাথে তাঁদের মহৎ সম্পর্ক। তাই যার উপর অন্যসব সম্পর্ক ও অনুষঙ্গকে কোরবান করা যায়।

কুরআন মাজীদে বায়তুল মাক্দিসের সপ্রশংস আলোচনা

বায়তুল মাকদিসের ভূখণ্ডিও হারম তথা পবিত্র ভূমি। যার অধৈ সম্মান ও মর্যাদার কারণ সেসব পবিত্রাত্মা নবী ও রাসূল যাঁরা এখানে সমাহিত আছেন। তাঁদের পবিত্র পদস্পর্শে তার ওই নিসবত ও মর্যাদা অর্জিত হয়েছে যা চিরকালের জন্য মহিমান্বিত লাওহে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

কুরআন মজিদে বায়তুল মাকদিসের বড়ত্ব, মহত্ব ও বরকতের আলোচনা করতে গিয়ে ইরশাদ করা হয়-

بَرْكَةٌ حَوْلَهُ لِتُرِيهِ مِنْ ءَايَتِنَا

-তার (বাইতুল মাকদিসের) চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের কুদরতের কিছু নির্দর্শন দেখিয়ে দেই।^১

يَقُومُ أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

-হে আমার সম্পদায়! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।^২

সম্পর্ক চাই সময় কেন্দ্রিক হোক কিংবা স্থানকেন্দ্রিক, ইশ্ক ও মুহাব্বতের দাবি হল, তার আলোচনা, তার চর্চা স্থানে স্থানে বিভিন্ন সময় হতে থাকা।

كَاهْ كَاهْ بَارِيَنَهْ رَا

-‘কখনো কখনো ফিরে দেখ পূর্বসূরীদের জীবন কাহিনী।’

ফরয নামাযের সঙ্গে আধিয়া-ই কিরামের সম্পর্ক

মহান আল্লাহ রাকবুল আলামীনের দস্তর-নিয়ম এই যে, তিনি নিজের প্রিয় ও নৈকট্যশীল বান্দাদের সেসব কাজকর্ম, ঘটনাবলি ও অবস্থাদি যা তাঁর দরবারে কবূল হওয়ার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছে তা ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত করেন যাতে তা স্মৃতি হিসেবে চিরদিন আওড়ানো যায়। তার একগুচ্ছ উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল-

^১. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ১

^২. আল-কুরআন, সূরা মায়দা, আয়াত : ২১

* হ্যরত আদম আলাইহিস্স সালাম তাওবা কবূল হলে যখন শুকরিয়া হিসেবে দু'রাকাত নামায পড়েছেন তখন ফজরের সময় ছিলো। তাঁর এই কর্মটি আল্লাহ তাআলার নিকট এতো ভালো লেগেছে, যার কারণে তাঁর এই শুকরিয়ার নামায ফজরের দু'রাকাত ফরয নামাযের ভিত্তি ও বুনিয়াদ হয়ে গেল।

* হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন মহান ফিদয়া কবূল হওয়ার ওপর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ চার রাক'আত নামায আদায় করলেন তখন যুহরের সময় ছিলো। আল্লাহ তাঁর শোকরিয়া আদায়ের এই নামায পসন্দ করলেন আর তা উচ্চতে মুহাম্মদীয়ার উপর ফরয করে দিলেন।

* হ্যরত ওয়াইর আলাইহিস সালামের ওপর একশো বৎসর যাবত মৃত্যু আপত্তি হয়েছিলো। তিনি যখন নবজীবন লাভ করলেন তখন চার রাক'আত নফল নামায পড়লেন শোকরিয়াস্বরূপ। তখন যেহেতু আসরের সময় ছিলো তাই আল্লাহ তাআলা সেই চার রাকাতকে আসরের ফরয নামায করে দিলেন।

* হ্যরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল ধরে ব্যাধি ভোগ করার পর সুস্থিতা নসীব হলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ চার রাক'আত নফল নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তিনি রাকাত নামায আদায় করে চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়াতে চাইলেন কিন্তু অতিশয় দুর্বলতার কারণে দাঁড়াতে পারলেন না, তাই তিনি রাকাতে সমাপ্ত করলেন। যেহেতু সময়টি মাগরিব ছিলো তাই আল্লাহ তাঁর এই তিনি রাকাতকে কবূলিয়াতের সম্মানে ভূষিত করে মাগরিবের ফরয নামায হিসেবে নির্ধারণ করলেন।

* ইশার নামাযের অনুষঙ্গ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সর্বপ্রথম যখন নামায আদায় করলেন তখন ইশার সময় ছিল। অতএব, তা ইশার ফরযের মূল বলে বিবেচিত হল।

আল্লাহর প্রিয়দের বাধ্যতামূলক কাজকর্ম মানাসিকে হজুর মূলভিত্তি হয়ে গেল কোনো কোনো সময় আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দার দ্বারা প্রকৃতিগতভাবে কোনো কাজ হয়ে যায় যা ইবাদতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু তা আল্লাহর কাছে এমন পছন্দসই হয়ে ওঠে যে, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার সঙ্গে ইবাদতের কোনো মিল থাকার কথা নয় তবুও তা সমষ্টিগতভাবে ইবাদতে শামিল করে দেওয়া হয়। যার দৃষ্টান্ত হ্যরত হাজেরা আলাইহাস সালামের পানি খুঁজতে গিয়ে সাফা-মারওয়া নামের পর্বতদ্বয়ের মাঝখানে দোঁড়ানো। যে ঘটনার বয়স শত সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর প্রিয় বাঁদীর সেই

কাজটি কতো যে ভালো লেগেছিলো, তাকে বিশ্বব্যাপী মহাসম্মেলন হজুর মানাসিকের একটি অনুষঙ্গ করে দিলেন।

যতদূর পর্যন্ত হজুর মৌলিক মানাসিক ও আরকানের সম্পর্ক রয়েছে আরাফার ময়দানে হাজীদের উপস্থিত হওয়ার নামই হজু। অর্থাৎ হজুর ফরযিয়্যাত তথা ফরয আদায়ের জন্যে কোনো প্রকার নফল ইবাদত ও হজুর খুতবা ছাড়া শুধুমাত্র আরাফায় উপস্থিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। এছাড়া বাকী সব আমল ও কাজকর্ম ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব পর্যায়ের।

আরাফাত শব্দটি আরবী। তার শাব্দিক অর্থ পরিচয় লাভ করা। আর তা সেই স্মরণীয় সাক্ষাতের নির্দশন যা হ্যরত আদম ও হ্যরত হাওয়া আলাইহাস সালামের মাঝে এই ঐতিহাসিক প্রান্তরে ঘটেছিলো জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার এবং দীর্ঘকাল ধরে বিয়োগ বিরহের পর। এখনে তাঁরা একে অপরকে পরিচয় করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ-মাকবূল বান্দাদ্বয়ের মিলনের স্মৃতিকে জাগরুক রাখতে প্রতি বছর ফিলহজুর নয় তারিখে হজু পালনকারীদের এই প্রান্তরে উপস্থিত হওয়াকেই হজুর মানাসিকের মূল ও ভিত্তি করে দিয়েছেন।

মহান যবাইয়ের স্মৃতি

মিনা প্রাঙ্গনে তাওহীদের রাজপুতদের মহাসমাবেশের কোরবানী সেই অতীত হয়ে যাওয়া দৃশ্যের স্মৃতিরক্ষার জন্যে যা মহান আল্লাহর ইচ্ছায় হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় কলিজার টুকরো পুত্রকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কোরবান করার জন্যে এই প্রান্তরে এনেছিলেন। পিতা-পুত্রের পূর্ণ বুঝাপড়ার পর হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়েছিলেন। এই অভূতপূর্ব কোরবানী যাকে 'যিবহে আজীম' বা সুমহান যবাই বলে স্মরণ করা হয় আল্লাহর কাছে মনঃপূত ও মকবূল হল আর ফিদয়াস্বরূপ একটি দুধা উৎসর্গ করা হল। সেই সুপ্রাচীন ঘটনাকে স্মারক রূপে চিরঞ্জীব রাখার জন্যে হাজীদেরকে হকুম দেওয়া হল, তারা যেন ফিলহজুর দশ তারিখে কোরবানীর পশ্চকে তাদের হাতে এই ঐতিহাসিক প্রান্তরে এনে উৎসর্গ করে।

হজুর মানাসিকসমূহ হ্যরত খলীল ও খলীলতনয় এর স্মারক

হজুর মানাসিকসমূহের উপর যদি আমরা গভীর দৃষ্টিপাত করি তবে এ বাস্তবতা আমাদের নিকট ফুটে উঠবে যে, হজুর আরকানে তথা মৌলিক করণীয় কার্যকলাপের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রকার সম্পর্ক রয়েছে হ্যরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালাম ও তাঁর সৌভাগ্যশালী পুত্র হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের। যেমন 'রমী' অর্থাৎ কংকর নিষ্কেপনের কর্মটি সেই স্মৃতি বহন করে যখন পিতা-পুত্র কুরবানী করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান তাদের পথেরোধ করে হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে প্রবণ্ণনা দিতে চাইলো এবং তাঁকে বলতে লাগলো যে, তোমার পিতা তোমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম শক্তির ঘড়্যন্ত্রের কথাটি পিতা হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে অবহিত করলেন, তখন তিনি কংকর নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন শয়তানের দিকে যাতে সে বুঝতে পারে যে, তার কোনো হামলা বা আক্রমণ তাঁদের ইচ্ছা ও প্রত্যয়ে সামান্যও আঁচ লাগাতে পারবে না। হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পাথরকুচি নিষ্কেপন কর্মটি আল্লাহর নিকট এতই পছন্দসই ও মনঃপূত হল যে, পৃথিবীর শেষ নিঃশ্বাস অবধি তা উম্মতে মুহাম্মদীর হজুর একটি অনুষঙ্গে পরিণত করে তাকে ইবাদতের অংশ করে দেওয়া হল।

যতক্ষণ না হাজীরা সেই চিহ্নিত শয়তানের উপর কক্ষ নিষ্কেপ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত হজু পূর্ণাঙ্গ হবেন। এই কাজটির যৌক্তিক কোনো বিশ্বেষণ চাইলে যুক্তি ও বিবেক কোনো সুরাহা দিতে পারবে না।

এভাবে পোশাকের ব্যাপারও। কা'বার নির্মাণের সময় পিতা-পুত্র উভয়ে দু'টি সাদা কাপড় গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। পোশাকটি -যা অত্যন্ত সাদাসিদে ভাবের বহিঃপ্রকাশ করে- আল্লাহর দরবারে এতই পছন্দসই হল যে, হাজীদের নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন তাদের নির্দিষ্ট ও স্থানীয় ফ্যাশনে সেলাইকৃত পোশাক খুলে ফেলে আমার প্রিয়দের সাদৃশ্য অবলম্বন পূর্বক শুধুমাত্র দু'টি চাদর পরিধান করে যাকে ইহরাম বলে নাম দেওয়া হয়েছে। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লোকজন ইহরামের চাদরে দেহ আবৃত করে সুন্নাতে ইবরাহীমি ও ইসমাইলির অনুসরণ করতঃ একই রঙে রঙিন দেখা যায়।

এভাবে হারম শরীফে সবাই নগ্নমন্তকে প্রবেশ করে। অথচ সাধারণত নগ্ন মাথায় মসজিদে ইবাদত করা আপত্তিকর ও সুন্নাতের বরখেলাফ বলে বিদিত। উপরন্তু তা কা'বা শরীফে; যেখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার জালাল ও মাহাত্ম্য, বড়ত্ব ও মহিমার সুউচ্চ প্রকাশ ঘটে। নগ্নমন্তক বিনয়-ন্যূনতা ও অসহায়ত্বের আলামত যা আল্লাহ রাকুল ইজ্জতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

তদ্রূপ এখানে মাথার চুল এবং নখ না কেটে বড় করে ফেলা সুন্নাতে ইবরাহীমিরই অনুসরণ। যদিও এসব কর্মতৎপরতার সঠিক ব্যাখ্যা যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয়, তারপরও আল্লাহর প্রিয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার দরুণ আল্লাহর দৃষ্টিতে

এতই প্রিয় হয়ে গেছে যে, তাকে মানাসিকে হজুর মর্যাদার আসনে সমাচীন করা হয়েছে। এখন তা পালন করা ব্যতিত হজু পূর্ণ হবেন।

তাওয়াফে সদস্তে চলার ভঙ্গি

কা'বার চতৃপাশে সাত চক্র দেওয়া যাকে সাধারণত পরিভাষায় তাওয়াফ নামে অভিহিত করা হয়, হজুর মানাসিকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাজীদের নির্দেশ প্রদান করা আছে যে, তারা প্রথম তিন প্রদক্ষিণে দস্ত করে হাঁটবে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! সাধারণ অবস্থায় দস্ত করে হাঁটলে অহংকার, আত্মপ্রাপ্তাদ ও অবাধ্যতার আলামত বলে গণ্য, যা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অমার্জিত কাজ অথচ হজু তার উল্লেট। রেওয়ায়েত মারফতে আমাদের নিকট যতটুকু তার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে তা হল, মুসলমানেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শক্রমে পবিত্র মক্কা থেকে পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন তখন লাগাতার যুদ্ধ-জিহাদ ও মেহনত-মুজাহাদার কারণে তাঁরা ক্ষীণকায় ও দূর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন ওমরা পালনের জন্য মদীনা শরীফ থেকে পবিত্র মক্কায় পৌছলেন তখন তাঁদের চাল-চলনে দূর্বলতার প্রকাশ পেলো। কা'বার তাওয়াফের মুহূর্তে তাঁদের ধীরতা ও ন্যূনতা দেখে মক্কার কাফেররা অপবাদ দিতে লাগলো যে, মুসলমানেরা মক্কায় যতদিন ছিলো ভালো মতে থেকে পেরেছিলো, স্বাচ্ছন্দে ছিলো, মদীনায় চলে যাওয়ার পর তাদের কি যে করণ অবস্থা হল, তারা ঠিকভাবে হাটতেই পারছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের অপবাদ ও বিদ্রূপাত্মক কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবায়ে কিরামকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কাফেরদের কথা ভুল প্রমাণিত করার জন্যে তাওয়াফের সময় দস্ত করে করে এবং ক্ষক্ষ হেলিয়ে দুলিয়ে চলবে। তখন থেকে এই ভঙ্গিমা হজুর মূল ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। অথচ তার পরে পরিস্থিতির ব্যাপক পটপরিবর্তন হয়েছে এবং হারমের পবিত্র অঙ্গনকে কাফির মুশরিকদের কলৃষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে।

মকামে ইবরাহীমকে নামাযস্তুল করার কারণ

কা'বার হারমের ওই স্থান যেখানে আল্লাহর প্রিয় খলীল হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কদম মুবারকের স্পর্শ লেগেছে তাকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করার ও নামাযস্তুল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَأَتْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

-আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা
বানাও।^১

আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে দু'রাকাত নামায আদায় করা
যাবে না কাঁবার তাওয়াফ পূর্ণ হবে না, হজু অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। এমনি তো
হারাম শরীফের পুরোটাই সম্মানিত, মর্যাদাবান; কিন্তু আল্লাহর কাছে সেই স্থানটি
যেখানে তাঁর প্রিয় খলিলের কদম ছুঁয়েছে এতো প্রিয়, এতো বেশী মুহাববতের পাত্র
হয়ে গেছে যে, সেখানেই সকলকে সিজদাবন্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

সাফা-মারওয়ার সাঁই (দৌড়)

সাফা ও মারওয়া মক্কা শরীফের দু'টি পর্বত। আল্লাহর ইরশাদের আলোকে
উভয়কে শা'আঙ্গুল্যাহ তথা আল্লাহর নিদর্শন বলা যায়। কুরআন মজিদে আল্লাহর
ঘোষণা নিম্নরূপ-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ

-নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন।^২

পৃথিবীতে কত পাহাড় পর্বত রয়েছে, তমধ্যে সাফা-মারওয়াকে আল্লাহর নিদর্শন
(শা'আঙ্গুল্যাহ) বলার কারণ ও রহস্য কি? তার পেছনে ওই ইতিহাস ও দাস্তান
উজ্জ্বল হয়ে আছে যার কেন্দ্রীয় ভূমিকায় আছেন হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস
সালামের মাতা ও হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদরের স্ত্রী হ্যরত
হাজেরা আলাইহাস সালাম, যাঁকে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর
নির্দেশে সেই বিরাগ উপত্যকায় রেখে গিয়েছিলেন। ইসমাইল তখন কচি শিশু ও
দুধের বাচ্চা ছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড ত্রুটা পেল, পিপাসায় কাতরাচ্ছন্দ দেখে
মমতাময়ী মা অস্ত্রির ও বে-কারার হয়ে গেলেন। হ্যরত হাজেরা আলাইহাস
সালাম কলিজার টুকরোকে মাটিতে রেখে উভয় পাহাড়ের মাঝখানে পানির সন্ধানে
পাগলের মতো দৌড়াতে লাগলেন, হায়! কোথাও পানির একটা ঝর্ণা পাওয়া
যেত! ব্যাকুল জননী সেই অস্ত্রিরতা ও পেরেশানির মুহূর্তে কয়েক চক্র প্রদক্ষিণ
করলেন। এই ভেবে তিনি শিশুকে ঢোকের আড়ালও করেন নি যে, কখনো বা
কোনো হিংসপ্রাণী তাকে ধরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর বাঁদীর এই
কর্মটি এমন মনঃপুত হল যে, সাফা ও মারওয়া পর্বতের সাঁইকে মানাসিকে হজ্রের

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৫

^২. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৮

অর্থভূক্ত করে পৃথিবীর শেষলগ্ন পর্যন্ত সকল হজু পালনকারীর জন্যে আবশ্যিক
করে দিলেন।

এই অপূর্ব উভ-দাস্তানের সমাপ্তি হয়েছে এভাবে যে, অবলা শিশু ইসমাইল ত্যওর
আতিশয়ে মাটিতে পায়ের গোড়ালির আঘাত করতে লাগলেন, তখনই আল্লাহর
রহমত জোশে এলো এবং পাথুরে ভূমির তলদেশ থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে
গেলো। আজ সহস্র বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও তা প্রবহমান এবং পুরো
বিশ্বজাহান তা থেকে তৃণ হয়ে যাচ্ছে। অমর এই ঝর্ণাধারা সর্বস্তরের মানুষের
কাছে যমযম নামে প্রসিদ্ধ। যমযমের পানি বহু রোগ-ব্যাধির জন্যে শেফা ও
প্রতিকারস্তর্কপ। যমযম পান করার আদব- তা অজু অবস্থায় এবং দাঁড়িয়ে পান
করতে হয়। অথচ সাধারণ পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাতে নববীর বরখেলাফ।
এর কারণ হল, এই পানির সঙ্গে হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পদস্পর্শ
ও সম্পর্ক হওয়ার ভিত্তিতে দুনিয়ার সকল পানির ওপরে তা শ্রেষ্ঠত্বের আসন
অলংকৃত করেছে।

কুরবানীর পশ্চও শা'আঙ্গুল্যাহ (নিদর্শন)

দুনিয়ার সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রতিটি স্থানে আল্লাহর নামে দান-সাদকার জন্য
প্রাণী যবাই করা হয়। কিন্তু হ্যরত ইসমাইল 'যবীঙ্গুল্যাহ' (আল্লাহর নামে
উৎসর্গিত) আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় মিনা প্রাত্মে কোরবানীর
উদ্দেশ্যে জবাইকৃত পশুসমূহ অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেলো। এই বিশেষ
মর্যাদা ও অনুষঙ্গের দরুন তা শা'আঙ্গুল্যাহর মর্তবা পেয়ে গেলো। যেমন
কুরআনে কারীমে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন-

وَالْبُدْرَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ

-আমরা সেই পশুগুলোকেই আল্লাহর নিদর্শন বানিয়েছি।^৩

এভাবে হাজরে আসওয়াদ, স্বীয় প্রকৃতিগুণে অপরাপর পাথরের ন্যায় একটি
পাথর। কিন্তু যেহেতু বিশ্বনবী হ্যরত সাল্লাল্যাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আপন
মুবারক হস্তে কা'বায় সংস্থাপন করলেন এবং মহিমান্বিত অধরে তাতে চুমো
খেলেন, হাজরে আসওয়াদ সে হিসেবে দুনিয়ার সকল পাথরের উর্ধ্বে সম্মান লাভ
করলো। অতএব, হাজরে আসওয়াদে চুমো খাওয়া ও তাকে সম্মান জানানো
হজ্রের মানাসিকভূক্ত হয়ে গেল।

³. আল-কুরআন, সূরা হজু, আয়াত : ৩৬

শেষ কথা

আমরা যদি গভীর চিন্তা করি, তা হলে হজুর মানসিক অধ্যয়নের পর আমাদের নিকট এই বাস্তবতা উত্তোলিত হবে যে, শরীয়ত আমাদের উপর ইবাদত সংক্রান্ত দু'ধরণের আমল বাতলে দিয়েছে। প্রথম প্রকারে ওই সব আমল অন্তর্ভুক্ত যা মূলত ইবাদত; যেমন নামায, রোয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারে ওইসব আমল শামিল আছে যা বাহ্যিক ইবাদতের পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু আল্লাহর প্রিয় ও মাকবূল বান্দাদের প্রতি তা মানসূব হওয়ায় আল্লাহর দৃষ্টিতে তা এমন প্রিয় ও মাহবুবিয়াতের মাকাম লাভ করেছে যে, তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পুনরাবৃত্তি করাই ইবাদত বলে সুনির্ধারিত হল। সমস্ত মানসিকে হজুর এটিই হিকমাত ও রহস্য, এটিই বাস্তবতা ও হাকীকত। যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি তার গভীরতায় কখনো পৌঁছতে পারে না যে, আল্লাহর মাহবুবদের কার্যকলাপ, প্রেমিকসূলভ কর্মপ্রণালী ইশ্ক-মুহাবত ও প্রেমব্যাকুলতার দর্পণস্বরূপ। মানসিকে হজুর অভ্যন্তরে শা'আঙ্গুলাহর সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করায় অন্তরে তাকওয়ার দীপ্তি আসে, খুলে যায় খোদাভীতির প্রত্যাশিত রাহে মনফিল। তাই আকল-বুদ্ধি ও যুক্তির ঝোঁড়া দাবিকে উপেক্ষা করে আরো আগে বাঢ়িয়ে শীর্ষ আদব রক্ষার্থে শির নত করে দেওয়াই মানসিকে হজুর প্রথম দাবি।

পঞ্চম অধ্যায়**হজুর পরিভাষা ও স্থানসমূহ****হজুর পরিভাষাবলি**

হজুর দিনগুলিতে ভালোমতে উপকৃত হতে চাইলে এবং হজু সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সূচারংভাবে বুঝার জন্যে হজুর বিবিধ পরিভাষা জানা অপরিহার্য বিষয়। হজু পালনেচ্ছুদের সুবিধার্থে আমরা এখানে বর্ণনা করে দিচ্ছি।

হজু : নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট ইবাদত প্রণালীর মাধ্যমে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করাকে হজু বলা হয়।

ওমরা : নির্ধারিত দিন ব্যতিত অন্য যে কোনো দিনে নির্দিষ্ট ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার নাম ওমরা।

মীকাত : সেই শেষ সীমানা যেখান থেকে হজু বা ওমরা পালনার্থী ইহরাম করা ছাড়া আগে বাড়তে পারে না। বাংলাদেশী ও পাকিস্তানীদের মীকাত 'ইয়ালামলাম', যা জিদ্দা যাওয়ার পথে প্রথমে পড়ে।

হিল্ল : 'হারাম' এর সীমানার বাইরে মীকাত পর্যন্ত স্থানকে 'হিল্ল' বলা হয়।

হারামে কা'বা : মক্কা মুকাররামার চতুর্দিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত জায়গাকে হারামের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে সীমানা নির্ধারিত করে দেওয়া আছে। সেই সীমানার ভেতরে সেখানকার কোনো হিংস্র পশু, এমনকি বন্য করুতরকেও জুলাতন করা, বরং সবুজ ঘাস পর্যন্ত উপড়ানো হারাম। পবিত্র মক্কার পুরোভাগ, মিনা, মুয়দালিফা এই সব 'হৃদ্দে হারাম' তথা হারামের আওতাভুক্ত। তবে আরাফাত হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আহলে হিল : ওই সব লোকদের আহলে-হিল বলা হয় যারা মীকাতের সীমানার ভেতরে ও হারামের সীমানার বাইরে বসবাস করে। তারা তাদের বাসস্থান থেকে ইহরাম করবে। এটাই তাদের ইহরামের ছক্কম।

আহলে হারাম : পবিত্র মক্কা ও হারামে বসবাসকারীদের আহলে-হারাম বলা হয়। হারামের পুরো জমিন আহলে হারামদের মীকাত, সেখানকার যে কোনো স্থান থেকে তারা ইহরাম করতে পারবে।

আফাকী : সেই বহিরাগত মুসলিম লোক, যে হজু আদায় করার জন্যে মীকাতের সীমানার বাইরে থেকে এসেছে।

ইয়াওমুন্ডারবিয়া : যিলহজ্জের ৮ম তারিখ হজ্জের ইবাদত আরম্ভ হয়। তাকে ইয়াওমুন্ডারবিয়া বলা হয়।

আরাফার দিন : যিলহজ্জের ৯ম দিন আরাফার ময়দানে হজু সম্পাদন হয় সে হিসেবে ওই দিনকে ইয়াওমে আরাফা তথা আরাফার দিন বলে।

ইয়াওমে নাহার : যিলহজ্জের ১০ম তারিখ। যেদিন কোরবানি করা হয় তাকে ইয়াওমে নাহার বলা হয়।

আইয়ামে তাশরীক : ৯ যিলহজ্জের ফজর থেকে ১৩ যিলহজ্জের আসর পর্যন্ত আইয়ামে তাশরীক। এসব দিনে ফরয নামাযের পর তাকবীর-এ-তাশরীক পড়া জরুরী। তাকবীর-এ-তাশরীক এই-

اَللّٰهُمَّ اكْبِرْ لَا إِلٰهٌ اَكْبِرْ اَكْبِرْ اَكْبِرْ وَاللّٰهُ اَكْبِرْ وَاللّٰهُ اَكْبِرْ

[আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হামদু]

-আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইহরাম : সেলাইবিহীন সেই পরিচ্ছেদ যা ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা যায় না। অর্থাৎ একটি নয়া বা পরিচ্ছন্ন চাদর গায়ে জড়ানোর জন্যে, তদ্বপ আরেকটি কোমর থেকে নিচে পরার জন্যে।

তালবিয়া : তালবিয়া অর্থ লাক্বাইক বলা। তালবিয়া এই-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

[লাক্বায়কা আল্লাহমা লাক্বায়কা, লাক্বায়কা লা শরীকা লাকা লাক্বায়কা, ইন্নাল হামদা ওয়াল্লান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শরীকা লাক]

-হাজির হে আল্লাহ! আমি (তোমার দরবারে) হাজির, আমি হাজির। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাজির। নিশ্চয় প্রত্যেক প্রকারের প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং রাজ্য তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

ইহরামের জন্যে একবার মুখে তালবিয়া উচ্চারণ করা জরুরি, নিয়ত করা শর্ত।

ইয়তেবা : তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে চাদরটি ডানের বাহুতে নীচে বের করে উভয় কিনারা বাম কাঁধের এভাবে ফেলে দিবে যে, ডান কাঁধ খোলা থাকে।

ইসতিলাম : উভয় হাতের তালু ও তার মাঝখানে মুখ রেখে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়া অথবা হাত বা কোনো কাঠি দ্বারা স্পর্শ করে চুমুর ইশারা করে হাতে চুম্বন করার নাম ইসতিলাম।

রামাল : তাওয়াফের প্রথম তিন প্রদক্ষিণে তাড়াতাড়ি ছোট ছোট পা ফেলা এবং কাঁধ মোচড়ানো, যেমন শক্তিশালী কোনো বাহাদুর লোক চলে।

তাওয়াফ : মসজিদুল হারামে কা'বা শরীফের চতুর্পাশে সুন্দরিষ্ঠ নিয়মে চক্র দেওয়াকে তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফে কুদূম : মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করার পর প্রথম তাওয়াফকে তাওয়াফে কুদূম বলা হয়। এই তাওয়াফ প্রত্যেক 'আফাকী- যিনি হজু-এ ইফরাদ বা ক্রিমানের নিয়তে মক্কায় প্রবেশ করে তাদের জন্যে মাসনূন।

তাওয়াফে যিয়ারত : তাওয়াফে যিয়ারত হজ্জের রূপকন। এটি ১০ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর হতে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত করা যায়। তবে ১০ যিলহজ্জ করাই উত্তম।

তাওয়াফে বিদা : বাযতুল্লাহ শরীফ হতে ফেরার সময় তাওয়াফ করাকে তাওয়াফে বিদা বলা হয়।

তাওয়াফে ওমরা : এই তাওয়াফটি ওমরা পালনকারীদের ওপর ফরয।

সাঁঙ্গি : সাফা থেকে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফার দিকে যাওয়া এবং 'মীলাইনে আখ্যারাইন' (সবুজ বাতি চিহ্নিত) এর মাঝে দৌড়াকে সাঁঙ্গি বলা হয়।

ওকুফে আরাফা : নবম যিলহজ্জ আরাফাতে অবস্থান করা, আল্লাহর ভয় ও খালিস নিয়তে যিকির, লাক্বাইক, দুআ, দরজ, ইসতিগফার এবং কালেমায়ে তাওহীদে মশগুল থাকা। যুহর ও আসর আদায় করা আর নামায থেকে ফারেগ হয়ে বিশেষ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দো'আয় সময় কাটানো।

রমী : মিনায় অবস্থিত তিনটি জামরায় (অর্থাৎ শয়তানদের) কংকর নিষ্কেপ করা।

হাদী : ওই প্রাণী যা কুরবানীর জন্যে ওয়াকফ করা যায়।

হলক : পুরো মাথা মুগানো। এটি উত্তম।

তাকসীর (কসর করা) : চুল কেটে ছোট করা, এটি করারও অনুমতি আছে।

হজুর স্থানসমূহ

কা'বা মুশাররাফা : কা'বা তথা বাযতুল্লাহ হজুর স্থানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহান স্থান। তারই হজু ও তাওয়াফ করা হয়। আর ওই মসজিদ যেখানে আল্লাহর এই ঘর অবস্থিত তাকে আল মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) বলা হয়।

রুক্কন : কা'বা শরীফের ওই কোণা যেখানে দু'টি দেওয়াল গিয়ে একত্রিত হয়েছে তাকে যাবিয়া বলা হয়। কা'বা শরীফের চারটি রুক্কন আছে।

১. রুক্কনে আসওয়াদ

দক্ষিণ পূর্ব কোণা যেখানে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত আছে।

২. রুক্কনে ইরাকী

উত্তর-পূর্বের কোণা যেখানে কা'বার দরজা আছে। দরজাটি উভয় রুক্কনের মাঝখানে পূর্ব দেয়ালে ভূমি থেকে পর্যাপ্ত উচুতে আছে।

৩. রুক্কনে শামী

উত্তর-পশ্চিম কর্ণারে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তখন বাযতুল মাকদাস সোজা সম্মুখে থাকবে।

৪. রুক্কনে ইয়ামানী

পশ্চিম আর দক্ষিণ কোণায় অবস্থিত।

হাজরে আসওয়াদ : এটি কালো বর্ণের একটি পাথর। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হল তখন দুধের চেয়ে শুভ ও ধৰ্মবে ছিলো। আদমজাতির গোনাহ তাকে একুপ কালো করে ফেলেছে। কা'বা শরীফে তাওয়াফের শুরু আর শেষ করার ক্ষেত্রে তা একটি চিহ্নের কাজ দেয়।

মূলতায়িম : পূর্ব দেওয়ালের ওই খণ্ড যা রুক্কনে আসওয়াদ থেকে কা'বার ফটক অবধি রয়েছে। তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে নামায ও দোয়া শেষ করে হাজীরা এখানে আসেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে ও স্বীয় বুক, পেট আর মুখমণ্ডল তাতে রাখেন এবং হাত উচু করে দেয়ালে বিস্তৃত করে দেন।

মীয়াবে রহমত : স্বর্ণনির্মিত সেই ড্রেন যা রুক্কনে ইরাকী ও রুক্কনে শামীর মাঝখানে দেওয়ালে ছাদের উপর স্থাপিত করা হয়েছে।

হাতীম : বাযতুল্লাহর উত্তরের দেয়ালের দিকে ভূমির একটি অংশ যার আশেপাশে একটি কামানের মতো ছোট দেয়াল নির্মিত হয়েছে। আর উভয় দিকে আসা-

যাওয়ার দরজা রাখা হয়েছে। এই ভূ-অংশটিকেও তাওয়াফে শামিল করে নেওয়া ওয়াজিব।

মুস্তাজার : রুক্কনে ইয়ামানী ও শামীর মধ্যখানে পশ্চিম দিকের দেয়ালের ওই অংশ যা মূলতায়িমের বিপরীতে রয়েছে।

মুস্তাজাব : রুক্কনে ইয়ামানী ও রুক্কনে আসওয়াদের মাঝখানের দক্ষিণ দেয়াল। এখানে সন্দর হাজার ফেরেশতা দোয়া-মুহূর্তে আমীন বলার জন্যে নিযুক্ত আছে, এ-কারণেই তার নাম মুস্তাজাব (প্রার্থনা যার গৃহীত) রাখা হয়েছে।

মকামে ইবরাহীম : কা'বার ফটকের সম্মুখে সংরক্ষিত একটি পালকি যেখানে সেই পাথর রাখা আছে যার উপর দাঁড়িয়ে সাইয়েদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাম কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পবিত্র পদ-চিহ্ন আজো তাতে অক্ষত আছে, তাকে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন।

যমযম শরীফের গম্বুজ : এই গম্বুজটি মাকামে ইবরাহীম হতে দক্ষিণ দিকে মসজিদেই অবস্থিত। ওই গম্বুজের ভেতর যমযম ঝর্ণাধারা রয়েছে। বর্তমানে গম্বুজটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।

বাবুস সাফা : মসজিদে হারামের দক্ষিণ ফটকসমূহের একটি ফটক।

বাবুস সালাম : এটি মসজিদে হারামের ওই ফটক যা দিয়ে প্রথমে প্রবেশ করা সর্বোত্তম।

সাফা : এটি পবিত্র কা'বার দক্ষিণে। এখানে প্রাচীনকালে একটি ছোট পর্বত ছিলো, যা এখন মাটিতে মিশে গেছে। এখন ওখানে কিবলামুখী একটি দালান সদৃশ নির্মাণ করা হয়েছে এবং উপরে আরোহনের জন্যে সিঁড়িও আছে।

মারওয়াহ : এটি সাফা পর্বতের পূর্বে একটি ছোট পর্বত ছিলো। এখানেও কিবলামুখী দালান ও সিঁড়ি বানানো আছে। সাফা হতে মারওয়া যাওয়ার সময় হাতের বামে পড়ে মসজিদে হারামের সীমানা।

মীলায়নে আখ্যারাইন : সাফা হতে মারওয়া পর্যন্ত যে দূরত্ব আছে তার মাঝখানে হারম শরীফের দেওয়ালে দু'টি সবুজ মাইল-ফলক স্থাপিত আছে, মাইলের শুরুতে যেরূপ পাথর লাগানো থাকে। এখন তো সেখানে সবুজ রঙের টিউব লাইট দিবা-রাত্রি উজ্জ্বল থাকে।

মাস'আ : সেই চিহ্নয়ের মধ্যস্থিত দূরত্ব। ওই দূরত্বকে দৌড়ে অতিক্রম করতে হয়। তবে অতিরিক্ত দৌড়া যাবে না এবং কাউকে কষ্টও দেওয়া যাবে না।

তানঙ্গিম : (মসজিদ-এ- আয়েশা) এটি সেই স্থান যেখান থেকে মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে ওমরার জন্য ইহরাম করা হয়।

যুল ত্লায়ফা : পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের মীকাত। মদীনা শরীফ থেকে পবিত্র মক্কার দিকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

যাতে ইরুক : এটি ইরাক হতে আগত হাজীদের মীকাত। পবিত্র মক্কা হতে ইরাকের দিকে অন্তত তিনিদিনের পথ।

জুহফা : এটি সিরিয়াবাসী হাজীদের মীকাত। পবিত্র মক্কা হতে সিরিয়ার দিকে তিন মন্দিলের দুরত্ব।

করন-আল মানাযিল : এটি নজদ থেকে আগমনকারীদের মীকাত।

আরাফাত : এটি একটি মহাপ্রশস্ত প্রান্তর। মিনা হতে প্রায় ১১ কি. মি. দূরত্বে। এখানে হজের খুতবা প্রদান করা হয়।

মাওকিফ : আরাফা ময়দানের ওই স্থান যেখানে নামাযের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করার নির্দেশ আছে।

বাতনে আরফা : এটি আরাফাতে হারমের নলসমূহ হতে একটি নল, যা মসজিদে নমিরার পশ্চিম পার্শ্বে অর্থাৎ কাবার দিকে অবস্থিত। এখানে ওকূফ তথা অবস্থান করা নিষিদ্ধ, এখানে দাঁড়ালে বা অবস্থান করলে হজু হবেন।

মসজিদে নমিরা : আরাফাত ময়দানের সম্পূর্ণ উপকর্ত্ত্বে একটি বিশালাকারের মসজিদ। তার পশ্চিমের দেয়াল যদি পতিত হয় তা হলে বাতনেই পড়বে।

জাবালে রহমত : আরাফাতের একটি পর্বত। ভূমি থেকে কমপক্ষে তিনশো ফুট উচ্চ আর সমৃদ্ধ-পৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট উঁচুতে। তাকে মাওকিফে আ'য়মও বলা হয়। তার সন্নিকটে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাওকিফ আছে, সেখানে কালো পাথর বিছানো রয়েছে।

মুয়দালিফা : আরাফাত আর মিনার মধ্যবর্তী একটি সুপ্রশস্ত প্রান্তর। আরাফাত থেকে প্রায় তিন মাইল দূরত্বে। এখান থেকে মিনার দুরত্বে অন্তত ততটুকুই। বলা হয়, আরাফা-প্রান্তরে তাওবা কর্তৃ হওয়ার পর হ্যরত আদম ও হ্যরত হাওয়া আলাইহিমুস সালাম মুয়দালিফায় এসে একত্রিত হয়েছিলেন।

মায়নীন : আরাফাত ও মুয়দালিফার পর্বতরাজির মাঝে একটি সংকীর্ণ পথ। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত হতে মুয়দালিফায় এই পথেই তশরীফ এনেছিলেন।

মাশ'আরে হারাম : মুয়দালিফার দু'পর্বতের মধ্যস্থিত একটি বিশেষ স্থানের নাম। পুরো মুয়দালিফাকেও মাশ'আরে হারাম বলা হয়। মুয়দালিফায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থানস্থলে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদও আছে, যাকে 'মসজিদ-এ মাশ'আরুল হারাম' বলা হয়। মাশ'আর-এ হারামকে 'কায়াহ'-ও বলা হয়।

ওয়াদী-এ মাহশার : ওয়াদী-এ মাহশার বা মুহাস্সার উপত্যকা সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে আস্থাবে ফীল (হস্তীবাহিনী) এর হাতি থেমে গিয়েছিলো এবং মক্কা মুকাররমার দিকে এগুতে পারে নি। এখানেই তাদের অনিবার্য ধ্বংস কার্যকর হয়।

মিনা : একটি প্রশস্ত ও খোলা প্রান্তর যা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। মুয়দালিফা হতে এখানে এসে রম্যে জিমার (প্রস্তর নিষ্কেপ) এবং কোরবানীসহ অন্যান্য কার্যাদি আদায় করা হয়।

মসজিদ-এ- খায়ফ : মিনার মশহূর ও বড় মসজিদ। খায়ফ উপত্যকাকে বলা হয়। লোকমুখে শোনা যায় যে, এই মসজিদে সন্তুরজন নবী সমাহিত আছেন। মসজিদে-খায়ফ এর উপর আটকোণ বিশিষ্ট একটি গম্বুজ আছে। ওই গম্বুজস্থলের ব্যাপারে বলা হয় যে, বহু পয়গাম্বর এখানে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুও এখানে স্থাপন করা হয়েছিলো।

জিমার : মিনা প্রান্তরে পাথরের তিনটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, ওগুলোর নামই জিমার। মিনা হতে মক্কা যাওয়ার পথে এসব পড়ে, ওগুলোর মধ্যে প্রথমটির নাম জামরা উলা, দ্বিতীয়টির নাম জামরা উসতা, আর তৃতীয়টির নাম জামরা উকবা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওমরার পালনীয় কাজসমূহ

হজ্জ ও যিয়ারাতের সফরের ‘আদাব’ (নীতি ও শিষ্টাচার)

প্রত্যেক হাজীর উচিত, যাত্রার পূর্বে সফরের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সম্পর্কে পুরনো হাজীদের কাছে জেনে নিয়ে একত্র করে নেওয়া এবং নিম্নবর্ণিত আদব ও নির্দেশনা সবিশেষ খেয়াল রাখা।

১. সর্বপ্রথম নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিবেন যে, এই সফরের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মতি ও রেজামন্দি। এ-ছাড়া সুনাম-সুখ্যাতি কুড়ানো বা ভ্রমণ-বিনোদন ও ব্যবসা ইত্যাদির কথা কখনো অন্তরে স্থান না দেওয়া।

২. নামায, রোয়া, যাকাতসহ যতো ইবাদত দায়িত্বে ওয়াজিব আছে সবই আদায় করবেন এবং তাওবা করে নিবেন, সাথে সাথে আগামীতে গোনাহে না জড়ানোর দৃঢ় ওয়াদা করবেন। তদ্রপ কর্জ থাকলে তাও আদায় করে নিবেন। যেসব লোকের আমানত আছে তাদের আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দিবেন। তেমনি আরো যেসব হকুক অনাদায়ী রয়েছে তাদের কাছে সে সব হক্ক আদায় করবেন বা ক্ষমা চেয়ে নিবেন। যাদের উপর কোনো অন্যায় করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। যাদের অনুমতি ব্যতীত সফর করা মাকরহ যেমন মাতা-পিতা ও স্বামী তাদের রায়ী করে অনুমতি চেয়ে নিবেন। এসব কাজকর্ম সেরেই হজ্জ ও যিয়ারাতের জন্য রাওয়ানা দিবেন।

৩. মহিলার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে স্বামী বা নির্ভরযোগ্য বালেগ মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম) থাকা জরুরী। অন্যথায় মহিলার সফর করা হারাম। মহিলা যদি স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত হজ্জ আদায় করে তা হলে তার হজ্জ তো আদায় হবে কিন্তু প্রতিটি কদমে কদমে তার গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হবে।

৪. হজ্জ পালনকারী প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা ও যাবতীয় আসবাবপত্র হালাল আয় থেকে নিয়েই বের হবেন। অন্যথা হজ্জ মাকবূল হওয়ার আশা করা যাবেনা। যদিও ফরয আদায় হয়ে যাবে। যদি সম্পদে হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থাকে তো কারো কাছ থেকে কর্জ নিয়ে হজ্জে যাবেন আর কর্জ নিজের মাল থেকে আদায় করবেন। টাকা-কড়ি ও অন্যান্য পাথেয় প্রয়োজনের চেয়ে একটু অধিক নিবেন,

যাতে সাথী-সঙ্গীদেরও সহায়তা এবং দরিদ্র ও মিসকিনদের সদকা করা যায়। এটি হজ্জে মাবরুর (মাকবূল হজ্জ) এর লক্ষণ।

৫. যেহেতু সফরকারীরা বিভিন্ন রকমের হতে পারে তাই প্রতিটি লোকের উচিত নিজের প্রয়োজন অনুসারে সফরের পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবেন, যাতে সফরে কষ্টের সম্মুখীন হতে না হয়। সকল হাজীর একই ধরণের আসবাব হয় না, তাই সুনির্দিষ্টভাবে কয়টি ও কি কি লাগবে তা বলা দুষ্কর।

ওমরার ফরয ও ওয়াজিবসমূহ

• ওমরার ফরয দু'টি

১. হৃদুদে হারামের বাইর থেকে ইহরাম পরা।
২. কা'বা শরীফের তাওয়াফ করা।

• ওমরার ওয়াজিব দু'টি।

১. সাফা মারওয়ার মাঝে সাতটি চক্র দেওয়া অর্থাৎ সাঁজ করা।
২. সাঁজের পর মাথার চুল মুওন করা বা কেটে কম করে ফেলা। (নারীদের বেলায় শুধুমাত্র কাটাটাই জরুরী।)

মীকাত

মীকাত বলা হয় ওই স্থানকে যেখান থেকে ইহরাম পরা ব্যতীত হারামের সীমানায় প্রবেশ করা নিষেধ। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, চীন, জাবা ও ইয়ামানবাসীর মীকাত হল ইয়ালামলাম।

ইহরামের পদ্ধতি

ইহরাম পরার পূর্বে দেহের বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া চাই। তাই ইহরামের পূর্বে নখ কেটে নেওয়া, নাভির তলদেশ ও বগলের লোম পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। গোঁফ ঠিক করে নিবে। এরপর ভালোভাবে ঘষে মেজে শরীর ধৌত করে নিবেন। মাথায ও শরীরে সুগন্ধি লাগাবেন। তারপর পুরুষ হলে স্বাভাবিক কাপড় খুলে ফেলে সেলাইবিহীন একটি চাদর লুপিস্বরূপ পরবেন, আরেকটি চাদর কাঁধে দিয়ে পরে নিবেন।

ইহরামের নিয়ত

ইহরাম পরার পর দু'রাকাত ইহরামের নিয়তে নামায পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরন (কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরন) আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস (কুল হ্যাল্লাহু আহাদ) পড়বেন। সালামের পর ইহরামের নিয়ত করতঃ মুখে বলবেন

اللَّهُمَّ نَوْنَتُ الْعُمْرَةَ وَأَخْرَمْتُ بِهِ فَقَبْلَهُ مِنِّي.

[আল্লাহমা নওআইতুল উমরতা, আহরামতু বিহি ফাতাক্সাকালহ মিন্নি।]

-হে আল্লাহ, আমি ওমরার নিয়ত করেছি এবং ইহরাম পরিধান করেছি।
আপনি তা আমার পক্ষ থেকে কবৃল করে নিন।

ইহরামের নিয়ত করার পর একবার তালবিয়া পাঠ করা ফরয। তিনবার বলা সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব। তালবিয়া সুউচ্চ স্বরে বলবেন, চিংকার দিয়ে নয়।

ওমরার নিয়ত

ইহরামের নিয়ত করার পর পরই হজ বা ওমরা বা দুটোই অথবা যেটির ইচ্ছা তার নিয়ত করে নিবেন। ওমরার নিয়তের মাছুর দোয়া এই-

اللَّهُمَّ إِنِّي أُزِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقْبِلْهَا مِنِّي وَأَعْنَى عَلَيْهَا وَبَارِكْ لِي فِيهَا
نَوْنَتُ الْعُمْرَةَ وَأَخْرَمْتُ بِهَا اللَّهَ تَعَالَى.

[আল্লাহমা ইন্নী উরীদুল উমরতা। ফাইয়াসসিরহা লী ওয়া তাক্সাকালহ মিন্নি।
ওয়া আইন্নী আলায়হা ওয়া বারিকলী ফী-হা, নাওয়াতুল উমরতা ওয়া
আহরামতু বিহা লিল্লাহি তাআলা।]

-হে আল্লাহ, আমি ওমরা করার ইচ্ছা করেছি। তা আমার জন্যে
সহজসাধ্য করে দিন। তা আমার পক্ষ থেকে কবৃল করে নিন। তা
আদায় করার জন্যে আমাকে সাহায্য করুন। তাতে আমাকে বরকত দান
করুন। আমি ওমরার নিয়ত করেছি আর ইহরাম পরেছি আল্লাহর
উদ্দেশ্যে।

নোট : হজে কিরানের নিয়ত করার সময় বলবেন, **لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجَّ** (লাক্বাইকা
বিল ওমরাতি ওয়াল হাজ্জি), তামাতু করার বেলায় বলবেন, **لَبَّيْكَ بِالْعُمْرَةِ** (লাক্বাইকা
বিল উমরাতি) এবং ইফরাদ করার নিয়তে বলবেন, **لَبَّيْكَ بِالْحَجَّ** (লাক্বাইকা বিল
হাজ্জি)।

তালবিয়া

তালবিয়ার শব্দাবলী এই-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

[লাক্বায়কা আল্লাহমা লাক্বায়কা, লাক্বায়কা লা শরীকা লাক্বায়কা,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নামাতা লাক্বায়কা লা শরীকা লাক্বায়কা]

-আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির, আমি হাজির। তোমার কোনো
অংশীদার নেই। আমি হাজির (হে আল্লাহ) অবশ্যই সকল প্রশংসা ও
দয়া-দান তোমারই। রাজত্বও তোমার, তোমার কোনো শরীক নেই।

হারামের সীমানায় প্রবেশ করার প্রাক্কালে খুব বেশী বেশী তালবিয়া পড়বেন।
নিজের কৃত গুনাহসমূহের স্মরণ করবেন। খুণ্ড-খুয়ু তথা অত্যন্ত বিনীতভাবে মাথা
ঝুঁকাবেন এবং অনুত্পন্ন হয়ে অঙ্গ ফেলবেন। এভাবে সামনে এগিয়ে যাবেন।

মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرْمَكَ وَحَرْمُ رَسُولِكَ فَحَرَمْ لَحْمِي وَدَمِي وَعَظِيمِي عَلَيَ النَّارِ
اللَّهُمَّ آمِنِي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبَعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أُولَائِكَ وَأَهْلِ
طَاعَتِكَ وَتُبِّ عَلَيَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ .

[আল্লাহমা ইন্না হায়া হারামুকা, ওয়া হারামু রাসূলিকা, ফাহারুরিম লাহমী ওয়া
দামী ওয়া আয়মী আলান্নারি। আল্লাহমা আ-মিন্নী মিন আয়া-বিকা ইয়াউমা
তাব'আসু ইবাদকা, ওয়াজ'আলনী মিন আউলিয়া-ইকা, ওয়া আহলি তা-
আতিকা ওয়া তুব আলাইয়া। ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রাহীম]

-হে আল্লাহ! এটি তোমার এবং তোমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসল্লাম) এর হারাম। আমার রক্ত ও হাত্তি-মাংস আগুনের উপর
হারাম করে দিন। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আয়াব থেকে মুক্ত রাখো
যে দিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান করবে। আমাকে তোমার
প্রিয়বান্দা ও তোমার অনুগতদের অস্তর্ভুক্ত করে দাও। আমার দিকে
রহমতের দৃষ্টি দাও। অবশ্যই তুমি তাওবা কবৃলকারী এবং বড় দয়াবান।

মক্কা নগরীতে প্রবেশের পর আপনি যখন মসজিদে হারামের দিকে যাওয়ার মনস্ত
করবেন তখন বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন। কেননা, এটি
সর্বোত্তম ও সালফে সালেহীন মহান পূর্বসুরীদের নিয়ম রূপে চলে আসছে।

বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশকালীন দোয়া

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحِينَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَذْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ
تَبَارِكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
وَمَغْفِرَتِكَ وَأَذْخِلْنِي فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ.

[আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, ফাহাইয়িনা রাক্বানা বিস সালাম, ওয়া আদবিলনাল জান্নাতা দারাস সালাম, তাবারকতা ওয়া তাআলাইতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিকা ওয়া মাগফিরাতিকা ওয়া আদবিলনী ফি-হা। বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুল্লাহি ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি]

-হে আল্লাহ! তুমি শান্তির মালিক। শান্তি তোমারই নিকট থেকে আসে। আমাদেরকে শান্তি সহকারে জীবিত রাখুন হে আমাদের রব। আমাদেরকে শান্তির ঘর জান্নাতে প্রবেশ করান। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মহা মঙ্গলময় এবং বহু উচ্চমর্যাদার মালিক। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমত ও মাগফিরাতের দ্বার উন্মুক্ত করুন এবং তাতে প্রবিষ্ট করুন। আল্লাহর নামে আরম্ভ। সমস্ত প্রশংসা আলাইহি ওয়াসালামের প্রতি।

বায়তুল্লাহর দিকে প্রথম দৃষ্টি

বায়তুল্লাহ শরীফে যখন প্রথম দৃষ্টি পড়বে, তখন তিনবার তাহলীল (লাইলাহ ইল্লাহ), তিনবার তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলবেন। অতঃপর আল্লাহর পবিত্র ঘরের দিকে চোখ লাগিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও ন্যূনতায় এই দোয়াটি পাঠ করবেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَعُوذُ بِرَبِّ الْبَيْتِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَضَيْقِ الصَّدْرِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِيهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ تَشْرِيفًا

وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَرِفْعَةً وَبِرًا، وَزِدْ بَيْتَكَ مَنْ شَرَفَهُ وَكَرَمَهُ وَعَظَمَهُ
مَنْ حَجَّهُ أَوْ اغْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَرِفْعَةً وَبِرًا.

[লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহ দাহ লা-শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহু হামদু
ওয়া হুয়া আলা কুণ্ডি শাইয়িন কাদীর। আউয়ু বিরবিল বায়তি মিনাল কুফরি
ওয়াল ফকরি ওয়া আযাবিল কবরি ওয়া দায়কিসু সদরি। ওয়া সাল্লাহু আলা
সাইয়িদিনা মুহাম্মদিন ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা
যিদি বায়তাকা তাশ্রিফান ওয়া তায়িমান ওয়া তাক্রিমান ওয়া মাহাবাতান
ওয়া রিফ্যাতান ওয়া বিরুনান। ওয়া যিদি ইয়া রাকি মন শারুরাফাহ ওয়া
কারুরামাহ ওয়া আয্যামাহ মিম্বান হাজ্জাহ আও ইতামারাহ তাশ্রিফান ওয়া
তাকরিমান ওয়া তায়িমান ওয়া মাহাবাতান ওয়া রিফ্যাতান ওয়া বিরুনান]

-আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই।
রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি সর্বশক্তিমান। আমি
আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ সম্মানিত ঘরের রবের কাছে- কুফর, দারিদ্র্য,
কবরের শান্তি, অন্তরের সংকীর্ণতা থেকে। আল্লাহর তাআলা রহমত ও
সালাম বর্ষণ করেন আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসালাম, তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি। হে আল্লাহ! তোমার এ
ঘরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। এবং হে রব! ওই ব্যক্তির সম্মান ও
মর্যাদা বড়িয়ে দিন যে এ ঘরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং যে এ
ঘরের সম্মানার্থে হজু এবং ওমরা করে থাকে।

এই দোয়ার পর আপনি লাক্বাইক বলে কা'বাতুল্লাহর দিকে কদম বাঢ়াবেন আর
হাজরে আসওয়াদের একেবারে সামনে এসে তাওয়াফের নিয়ত করবেন।

তাওয়াফ : ইয়তেবা

তাওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে আপনি কা'বা শরীফের ওই কোণায় আসুন যেখানে
হাজরে আসওয়াদ রয়েছে। সেখানে এসে আপনি শেষ বার লাক্বাইক বলে বন্ধ
করে দিন। এরপর ইয়তেবা অর্থাৎ চাদরটি ডান বগল থেকে বের করে উভয়
কিনারা বাম কাঁধে এভাবে রাখবেন যেন ক্ষম্ব খোলা থাকে। অতঃপর কা'বার
দিকে মুখ করে আপনার ডানে হাজরে আসওয়াদের দিকে চলা শুরু করবেন।
যখন হাজরে আসওয়াদ সামনে আসবে তখন তাওয়াফের নিয়ত করবেন।

তাওয়াফের নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنْيَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَّهُ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ.

[আল্লাহম্মা ইন্নি উরিদু তাওয়াফ বায়তিকাল হারামে ফাইয়াসিরহ লি ওয়া তাক্সাক্সাল্লাহ মিন্নী সবআতা আশওয়াতিন লিল্লাহি তাআলা আয্যা ওয়াজাল্লা]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার মহা-পবিত্র ঘরের তাওয়াফের নিয়ত করছি।
তাই হে আল্লাহ! তুমি তা আমার জন্যে সহজ করে দাও। আমার পক্ষ
থেকে সাত চক্রের তাওয়াফ করুন করে নাও। তা শুধুমাত্র তুমি একক
সত্তা মা'বুদের জন্যেই করছি।

ইস্তিলাম

তাওয়াফের নিয়তের পর কা'বাকে সামনে রেখে নিজের ডান দিকে একটু সামনে
এগিয়ে গিয়ে হাজরে আসওয়াদের সোজা দাঁড়িয়ে কানপর্যন্ত হাত এভাবে ওঠাবেন
যে, হাতের তালুদ্বয় হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকে এবং বলবেন-

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.

[বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়াসু সালাতু ওয়াসু
সালাম আলা রাসুলিল্লাহ]

-আল্লাহর নামে আরম্ভ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ মহান।
রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম
বর্ণিত হোক।

সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে চুমো দিবেন। আর যদি ভিড়ের কারণে চুমো
সম্ভব না হয় তা হলে হাতে তার দিকে ইশারা করে হাতে চুমো খাবেন। আর
নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে কা'বার দিকে অগ্রসর হবেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنَا بِكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ بِإِيمَانِي لِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[আল্লাহম্মা ঈমানান বিকা ওয়া ইতিবাআন লি সুন্নাতি নাবিয়িকা সাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

-হে আল্লাহ! তোমার উপর ঈমান এনে এবং তোমার নবীর সুন্নাতের
অনুসরণে (এ তাওয়াফ সম্পন্ন করছি)।

যখন হাজরে আসওয়াদ অতিক্রম করবেন তখন খানায়ে কা'বাকে হাতের বামে
নিয়ে তাওয়াফের দোয়া পড়ে পুরুষরা রমল করে আগে এগিয়ে যাবে।

নোট : যদি তাওয়াফের দোয়া জানা না থাকে তাহলে সুবহানাল্লাহ,
আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার অথবা ইস্তিগ্ফার বা কালেমায়ে শাহাদাতের
যিকির চালু রাখবেন। এরপর তাওয়াফে যত অগ্রসর হবেন তত চেষ্টা করবেন
যেন প্রতিটি রূকনের দোয়া তার সামনে পড়তে পারেন।

তাওয়াফে প্রতিটি রূকনের পৃথক পৃথক দোয়া

কা'বা শরীফের চারটি রূকন। সেসব রূকনের আলাদা আলাদা দোয়া আছে। যদি
সম্ভব হয় তা হলে ওই সব দোয়া মুখস্থ করে নিবেন। তাওয়াফের সময় যখনই
কোনো রূকনের সম্মুখে হবেন তখন তার দোয়া পাঠ করে নিবেন।

১. তাওয়াফে রূকনে ইরাকীর দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّكِ وَالشَّكِّ وَالنَّفَاقِ وَالشَّقَاءِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ
وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْهَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ.

[আল্লাহম্মা ইন্নি আউয়ুবিকা মিনাস শিরকি ওয়াসু শকি ওয়ান নেফাকি ওয়াশ
শিকায়ি ওয়া সু-য়িল আখলাকি ওয়া সু-য়িল মুনকালিবি মিল মালে ওয়াল
আহলে ওয়াল ওয়ালাদে]

-হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় খুঁজছি শিরক, সন্দেহ, কপটতা,
মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ও অশুভ চরিত্র থেকে। আরো
আশ্রয় চাই তোমার কাছে মাল-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের কাছে
শ্রীহীন প্রত্যাবর্তন থেকে।

২. তাওয়াফে রূকনে শামীর দোয়া

اللَّهُمَّ اجْعِلْهُ حَجَّاً مَبْرُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَبْبًا مَغْفُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تُبُورَ أَيَا
عَزِيزُ يَا غَفُورُ.

[আল্লাহম্মা আলহ হাজ্জাম মাবরুরা ওয়া সায়াম মাশকুরা ওয়া যামবাম
মাগফুরা ওয়া তিজারাতান লান তাবুরা ইয়া আজিজু ইয়া গফুর]

-হে আল্লাহ এই হজুকে যে কোনো গুনাহ থেকে মুক্ত রাখো। আমার
চেষ্টা সাধনাকে মাশকুর (সফল) করো। আমার গুনাহ-খাতাগুলি ক্ষমা

করে দাও। এমন ব্যবসা আমাকে নসীব করো যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। তুমিই একমাত্র বিজয়ী ও ক্ষমাকারী।

৩. তাওয়াফে রূকনে ইয়ামানীর দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

[আল্লাহহ্মা ইন্নি আউয়ুবিকা মিনাল কুফরি ওয়া আউয়ুবিকা মিনাল ফাকরি ওয়া মিন আযাবিল কবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাতি ওয়া আউয়ুবিকা মিনাল খিয়ি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরতি]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি কুফর হতে, আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি অভাব থেকে, কবর জগতের আযাব হতে এবং হায়াত-মওতের সকল ফেতনা হতে। আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছি দুনিয়া আখিরাতের অপমান হতে।”

৪. রূকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্তের দোয়া

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقَنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

[রাকবানা আ-তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরতি হাসানাহ, ওয়াকিনা আযাবান্নারি ওয়াআদ খিলনাল জান্নাতা মা'আ আবরারি ইয়া আজিজু ইয়া গফ্ফারু ইয়া রাকবাল আলামীন]

-হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর। আমাদেরকে দোষখের শান্তি থেকে রক্ষা কর। সৎবান্দাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে মহা সম্মানিত বড় ক্ষমাশীল! হে সমস্ত জাহানের প্রতিপালক!

এই দোয়াটি পড়ে হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসবেন এবং যদি সম্ভব হয় তা হলে চুমো খাবেন আর যদি সম্ভব না হয় দূর হতে ইস্তিলাম করবেন। আর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার আলহামদুলিল্লাহ বলে এর আগে গিয়ে তাওয়াফের চক্রের দোয়া শুরু করবেন।

নোট : এখন নীচে তাওয়াফের সাত চক্রের পৃথক পৃথক দোয়া দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি চক্রের দোয়া রূকনে ইয়ামানীর পূর্বে শেষ করবেন। এরপর রূকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উপরোক্ত দোয়া পড়বেন।

তাওয়াফে সাত চক্রের পৃথক পৃথক দোয়াসমূহ

হাজরে আসওয়াদ থেকেই প্রতিটি চক্র আরম্ভ করবেন, আর তাতে এসেই শেষ করে দিবেন এভাবে সাত চক্র পূর্ণ করে নিবেন। কিন্তু রামল করবেন শুধুমাত্র প্রথম তিন প্রদক্ষিণে আর বাকী চারটিতে সাধারণভাবে চলবেন।

প্রথম চক্রের দোয়া

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَكَ وَتَضْدِيقًا
بِكَبَابِكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغَفْرَوَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاهَا الدَّائِمَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالْفَوْزُ
بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاهَةِ مِنَ النَّارِ.

[সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ওয়াস্সালাতু ওয়াস্স সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহহ্মা ঈমানাম বিকা, ওয়া তাসদীক্তাম বিকালিমা-তিকা ওয়া ওয়াক্ফা আম্বি-আহদিকা ওয়াস্তিবা- আন লিসন্নাতি নাবিয়িকা ওয়া হাবীবিকা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহহ্মা ইন্নি আস-আলুকাল আফওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ওয়াল মু'আফাতান্দা-ইমাতা ফিদীন ওয়াদুনিয়া ওয়াল আ-খিরাতি ওয়াল ফাউয়া বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নারি]

-আল্লাহ তাআলা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্ত। আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযোগি নয়। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়। নেই ক্ষমতা সৎকাজ করার, না গুনাহ থেকে বাঁচার আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। যিনি খুবই উচ্চ মর্যাদাশীল ও মহান। আর তাঁরই পরিপূর্ণ রহমত ও তাঁরই শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। হে আল্লাহ! তোমারই উপর ঈমান এনে, তোমার বিধানের সত্যতা মেনে নিয়ে, তোমারই অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য এবং তোমারই

তোমার বান্দাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে। হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাত দান কর কোন হিসাব ছাড়াই।

তৃতীয় চক্রের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَالشَّرِكِ وَالشَّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ
وَسُوءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلِبِ فِي النَّهَارِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ
وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

[আল্লাহমা ইন্নি আ'উবিকা মিনাশ শাককি ওয়াশ শিরকি ওয়াশ নিফাকি ওয়া সূ-ইল আখলাকি ওয়া সূ-ইল মানযারি ওয়াল মুনক্কালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি ওয়াল ওয়ালাদি। আল্লাহমা ইন্নি আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা ওয়া আ'উবু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান নার। আল্লাহমা ইন্নি আ'উবিকা মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আ'উবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্যা ওয়াল মামা-ত]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আয়াতসমূহ ও বিধানাবলীতে) সন্দেহ করা থেকে, তোমার শরীক স্থির করা থেকে, (তোমার বিধানে) বিরোধিতা করা থেকে, মুনাফিকী থেকে এবং দুশ্চরিত্র, মন্দ-দৃশ্য ও ধ্রংস থেকে, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে মন্দ পরিণাম থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থী তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার শান্তি থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা থেকে এবং তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি জীবনের ফিতনা থেকে এবং (আশ্রয় চাচ্ছি) মৃত্যুর যত্নণা থেকে।

চতুর্থ চক্রের দোয়া

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّاً مَبْرُورًا، وَسَعِيًّا مَشْكُورًا وَذَبَابًا مَغْفُورًا وَعَمَلاً صَالِحًا
مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لَنْ تُبُورًَا يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ أَخْرِجْنِي يَا اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَوْجَبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ

সত্যনবী ও প্রিয় বক্সু (হাবীব), আমাদের আকৃ হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে (এ তাওয়াফ সম্পন্ন করছি।) হে
আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ক্ষমা, প্রত্যেক বিপদ থেকে
শান্তি, আর (প্রত্যেক কষ্ট থেকে) স্থায়ী সুরক্ষার- দ্বীন, দুনিয়া ও
আবিরাতে আর জান্নাতের সফলতা ও দোষথের মুক্তির।

তৃতীয় চক্রের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَأَنَا
عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرَمٌ لِحُومَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى
النَّارِ اللَّهُمَّ حَبَّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَرَزَّيْنَاهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرَّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ قَنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبَعَّثُ عِبَادُكَ اللَّهُمَّ
اَرْزُقْنِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

[আল্লাহমা ইন্না হা-যাল বায়তা বায়তুকা, ওয়াল হারামা হারামুকা, ওয়াল
আমনা আমনুকা, ওয়াল আবদা আবদুকা, ওয়া আনা আবদুকা ওয়াব্নু
আবদিকা ওয়া হায়া মাকামুল আয়ির্যি বিকা মিনান্নার। ফাহাররিম লুহমানা ওয়া
বাশারাতানা আলান্ন নাবা। আল্লাহমা হাববিব ইলায়নাল ঈমা-না ওয়া যায়িন্হ
ফী কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলায়নাল কুফরা ওয়াল ফুসুক্কা ওয়াল ইসিয়ানা
ওয়ার্জার্জালনা মিনার রাশেদীন। আল্লাহমা ক্লিনী আয়াবাকা ইয়াউমা তাব'আসু
ইবাদকা। আল্লাহমারযুক্তিল জান্নাতা বি-গায়রি হিসাব।]

-হে আল্লাহ! নিশ্চয় এ ঘর, এ হেরেম তোমারই পবিত্র হেরেম, এখানকার
নিরাপত্তা ও শান্তি তোমারই (প্রতিষ্ঠিত)। প্রত্যেক বান্দা তোমারই বান্দা
এবং আমি অক্ষমও তোমারই বান্দা এবং তোমার বান্দারই সন্তান। আর
এ স্থানটা তোমারই আশ্রয় প্রহণকারীর দোষথের আগুন থেকে। সুতরাং
হারাম করে দাও আমাদের মাংস ও চামড়াকে দোষথের আগুনের উপর।
হে আল্লাহ! আমাদেরকে ভালবাসা দান কর ঈমানের এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত
করে দাও সেটাকে আমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে। আর ঘৃণা সৃষ্টি করে
দাও আমাদের মধ্যে কুফর, অবাধ্যতা ও আদেশ অমান্য করার প্রতি
এবং আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত কর হিদায়তপ্রাপ্ত লোকদের। হে আল্লাহ!
রক্ষা কর আমাকে তোমার ঐ কিয়ামতের শান্তি থেকে যেদিন তুমি

إِنْمَّا وَالغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ رَبُّ قَنْعَنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِيْ وَأَخْلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِيَّةٍ لِيْ مِنْكَ بِخَيْرٍ.

[আল্লাহজ'আলহ হৃজ্জাম মাবরুরাও ওয়া সাইয়াম মাশকুরা ওয়া যামবাম মাগফুরাও ওয়া আমালান সা-হিলান মাক্বুলাও ওয়া তিজারাতাল সান তাবুরা, ইয়া আ-লিমা মা-ফিসসুদুরি আখরিজনী ইয়া আল্লাহ মিনায যুলুমাতি ইলান্নুরি। আল্লাহস্মা ইন্নী আসআলুকা মূ-জিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আয়া-ইমা মাগফিরাতিকা ওয়াস সালামাতা মিন কুণ্ডি ইসমিন ওয়াল গানীমাতা মিন কুণ্ডি বিরারিন ওয়াল ফাউয়া বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নার। রাবি কান্নি নি বিমা রাখাকৃতানী ওয়া বা-রিকলী ফীমা আ'তায়তানী ওয়াখলুফ আলা কুণ্ডি গা-ইবাতিল সী মিনকা বিধায়রিন]

-হে আল্লাহ! কবুলিয়তের মর্যাদা দান কর (আমার) এ হজকে (রিয়াকারী থেকে রক্ষা কর), আমার প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য কর; আমার (এ হজকে) পাপসমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ করে দাও এবং একটা গৃহীত সৎ কর্মস্বরূপ ও এমন এক ব্যবসাস্বরূপ, যাতে লোকসান নেই। হে অন্তরসমূহের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত সত্ত্ব! আমাকে বের করে আন। হে আল্লাহ! রাশি রাশি অঙ্ককার থেকে আলোর দিকে। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থী হই তোমার রহমত অর্জন করার উপায়সমূহের এবং তোমার ক্ষমা লাভ করার জরুরী আস্বাবের আর সমস্ত পাপ থেকে বেঁচে থাকার, প্রত্যেক প্রকার সৎকর্মের শক্তির; আর জান্নাত লাভের ও দোষখ থেকে রক্ষা পাবার। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পরিতৃষ্ণ করে দাও এ জীবিকার উপর, যা তুমি আমাকে প্রদান করেছ। এবং বরকত দান কর এ বস্তুতে, যা তুমি আমায় দান করেছ। আর আমার প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয়ের উপর তোমার থেকে আমার জন্য কল্যাণকে স্থলাভিষিঞ্চ করে দাও (আর রক্ষা কর)।

পঞ্চম চক্রের দোয়া

اللَّهُمَّ أَظِلْنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ عَرْشِكَ وَلَا يَأْتِي إِلَّا
وَجْهَكَ وَاسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ شَرِبَةَ هَنِيَّةَ مَرِيَّةَ لَا نَظِمَّاً
خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِي وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحْمِلْهُ عَنِّي
وَأَغْثِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَغْصِيَكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ
أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَتَعْيِمَهَا وَمَا يُقْرَبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَلَمْعُوذُكَ
مِنَ النَّارِ وَمَا يُقْرَبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

[আল্লাহমা আযিল্লানী তাহতা যিল্লি আরশিকা ইয়াউমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লা আরশিকা, ওয়ালা বা-ক্লিয়া ইল্লা ওয়াজহাকা ওয়াসক্লিনী মিন হাউয়ি নাবিয়িকা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারবাতান হানী-আতাম মারী-আতালু লা নায়মাউ বাদাহা আবাদান। আল্লাহস্মা ইন্নী আসুআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহ নাবিয়ুক্কা সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন শার্রি মাস্তা'আযাকা মিনহ নাবিয়ুক্কা সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহস্মা ইন্নী আসুআলুকা জান্নাতা ওয়া নাঈমাহা ওয়ামা ইউক্সারিবুনী ইলায়হা মিন ক্লাউলিন আউ ফিলিন আউ আমালিন। ওয়া আ'উয়ুবিকা মিনান্নারি ওয়ামা ইযুক্সারিবুনী ইলায়হা মিন ক্লাউলিন আউ ফিলিন আউ আমাল]

-হে আল্লাহ! আমাকে স্থান দান কর তোমার আরশের ছায়াতলে যেদিন কোথাও ছায়া থাকবেনা তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত এবং স্থির থাকবেনা কেউ তোমারই যাত ব্যতিরেকে এবং আমাকে পান করাও তোমার নবী, আমাদের আক্তা (মুনিব) হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'হাউয়ে কাউসার' থেকে- তৃণ্ডিয়াক মিষ্ট পানীয়, যা পান করার পর আমাদের কখনো পিপাসা হবেনা। আমি আশ্রয় চাই এসব অনিষ্ট হতে যা হতে আশ্রয় চেয়েছেন আমাদের নবীজি এবং আমি তোমার কাছে জান্নাত ও তার নেয়ামত দানের প্রার্থনা জানাই এবং প্রত্যেক ওই কথা, কাজ ও আমলের সামর্থ চাই যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে এবং জাহান্নাম ও জাহান্নাম উপযোগি কথা, কাজ ও আমল থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

ষষ্ঠ চক্রের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَى حُقُوقِنَا كَثِيرَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَنَا كَثِيرَةٌ وَحُقُوقُنَا كَثِيرَةٌ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِي وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحْمِلْهُ عَنِّي
وَأَغْثِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَغْصِيَكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّا

سُوَالٌ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيمٌ وَوَجْهُكَ كَرِيمٌ وَأَنْتَ يَا اللَّهُ
حَلِيمٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفِفْ عَنِّي.

[আল্লাহমা ইন্না লাকা আলাইয়া ত্রকুকান কাসীরাতান ফীমা বায়নী ওয়া বায়নাকা, ওয়া ত্রকুকান কাসীরাতান ফীমা বায়নী ওয়া বায়না খালক্তিকা। আল্লাহমা মা কানা লাকা মিন্হা ফাগফিরভলী, ওয়ামা কা-না লিখাল্ক্তিকা ফা-তাহাম্বালহ ‘আল্লী, ওয়া আগুনিনী বিহালালিকা ‘আন হারা-মিকা, ওয়া বি-তা’আতিকা ‘আন্ মা’সিয়াতিকা, ওয়া বিফাদ্লিকা ‘আম্বান্ সিওয়াকা এয়া ওয়াসিয়াল মাগফিরা। আল্লাহমা ইন্না বায়তাকা আয়ীমুন ওয়া ওয়াজ্হাকা কারীমুন ওয়া আনতা ইয়া আল্লাহ কারীমুন আয়ীমুন, তুহিকুল আফওয়া ফা’ফু আল্লী]

-হে খোদা! নিশ্চয় আমার উপর তোমার প্রাপ্য রয়েছে ঐসব বিষয়ের মধ্যে যেগুলো আমার এবং তোমার মধ্যে রয়েছে। এবং বহু প্রাপ্য রয়েছে এই সব বিষয়ের মধ্যে যে গুলো আমার এবং তোমার সৃষ্টির মধ্যেই। হে আল্লাহ! তন্মধ্যে যেগুলো তোমার প্রাপ্য, সেগুলো তুমি ক্ষমা করে দাও। আর তোমার সৃষ্টির যে প্রাপ্য আমার উপর থেকে যায়, তা (সৃষ্টির নিকট থেকে) ক্ষমা করানোর তুমি জিম্মাদারী নাও। আর আমাকে ধনী করে দাও তোমার হালালকৃত উপার্জনের তৌফিক দিয়ে, হারাম উপার্জন থেকে (রক্ষা করে) এবং তোমার আনুগত্যের মধ্যে রেখে-অবাধ্যতায় পতিত হওয়া থেকে এবং তোমার স্থায়ী অনুগ্রহ করে, তুমি ছাড়া অন্য কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে। হে অত্যন্ত ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! নিশ্চয় তোমার ঘর মহান এবং তোমার সত্তা অত্যন্ত দয়ালু এবং হে আল্লাহ! তুমি বড় সহনশীল, দাতা ও মহান। আর তুমি ক্ষমা কামনা করাকে পছন্দ কর। সুতরাং আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা কর।

সপ্তম চক্রের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَقُلْبًا خَاشِعًا
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَتُوبَةً نَصُوحًا وَتُوبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً
عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ
اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَّا

بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاهَةِ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ رَبُّ زِدْنِي عِلْمًا وَالْحِقْنِي
بِالصَّالِحِينَ.

[আল্লাহমা ইন্নী আস্তালুকা ঈমানান কামিলাও ওয়া ইয়াকুনান্ সাদিকান। ওয়া রিয়ক্তাও ওয়াসিআও ওয়া ক্লবান থা-শিআও ওয়া লিসানান যা-কিরাও ওয়া হালালান তৈয়েবাও ওয়া তাওবাতান নাসুহাও ওয়া তাওবাতান ক্লাবলাল মাউতি ওয়া রা-হাতান ইন্দাল মাউতি ওয়া মাগফিরাতাও ওয়া রাহমাতাম্ বা'দাল মাউতি ওয়াল 'আফওয়া ইন্দাল হিসাবি ওয়াল ফাউয়া বিল জান্নাতি ওয়ান্ নাজা-তা মিনান্নার। বিরাহমাতিকা ইয়া আয়ীযু ইয়া গাফ্ফার। রাকি যিদ্বী ইলমাও ওয়া আলহিকুনী বিস্স সা-লিহীন]

-হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিকট পরিপূর্ণ ঈমান, সাচ্ছা ইয়াকুন, জীবকার প্রাচূর্য, বিন্যো অন্তর তোমার যিকিরকারী মুখ, পবিত্র ও হালাল জীবিকা (নিষ্ঠাপূর্ণ) তাওবা। আরো চাচ্ছি- তাওবার শক্তি মৃত্যুর পূর্বে, শান্তি মৃত্যু যন্ত্রণার সময়, ক্ষমা ও দয়া মৃত্যুর পর, ক্ষমা হিসাব-নিকাশের সময়, সাফল্য জান্নাত প্রাপ্তিতে এবং নাজাত (মুক্তি) দোয়্যথ থেকে, তোমারই দয়ার বদৌলতে, হে মহা পরাক্রমশাল, মহা ক্ষমাশীল। হে রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর এবং আমাকে নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত কর।

তাওয়াফের সকল চক্র পরিপূর্ণ করার পর হাজরে আসওয়াদকে চুমো খাবেন এবং ইসতিলাম করবেন। এরপর মাকামে ইবরাহীমে দু’রাকাত নামায পড়বেন যা ওয়াজিব এবং দোয়া করবেন।

মাকামে ইবরাহীমের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاقْبِلْ مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَاغْطِنِي
سُؤَالِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِذُنُوبِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي
وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصْبِيَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا مِنْكَ بِهَا
قَسَمْتَ لِي أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوْفِنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ
اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةَ إِلَّا

قَضَيْتَهَا وَيَسَرَّهَا فَيَسَرَّ أُمُورَنَا وَأَشْرَخَ صُدُورَنَا وَنَوَّزَ قُلُوبَنَا وَأَخْتِنَ
بِالصَّالِحَاتِ أَعْبَدَنَا اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَرَابًا وَلَا
مَفْتُونِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

[আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তা'লামু সির্রি ওয়া আলা-নিয়্যাতি ফাকুবাল মায়িরাতী ওয়া তা'লামু হা-জাতী ফাআ'তিনী সুয়ালী ওয়া তা'লামু মা'ফী নাফসী ফাগ্ফিরলী যুনূবী। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ঈমা-নান ইযুবাশির ক্ষালবী ওয়া ইয়াকুনান সাদিক্ষান হাস্তা আলামা আন্নাহ লা-ইযুসীবুনী ইল্লা মা কাতাব্তা লী, ওয়া রিদামু মিন্কা বিমা ক্ষাসামতা লী। আন্তা ওয়ালিয়ী ফিদুনিয়া ওয়াল আ-বিরাহ। তাওয়াফফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আলহিক্সনী বিস্সালেহীন। আল্লাহুম্মা লা-তাদা' লানা ফী মাক্কামিনা হায়া যাম্বান ইল্লা গাফারতাহ ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্রাজতাহ ওয়ালা হাজাতান ইল্লা ক্ষাদায়তাহ ওয়া ইয়াস্সারতাহ ফাইয়াস্সির উম্রানা ওয়াশ্রাহ সুদূরানা ওয়া নাভির কুল্বানা ওয়াখ্তিম বিস্সালিহা-তি আমালানা। আল্লাহুম্মা তাওয়াফফানা মুস্পিমীন। ওয়া আলহিক্সনা বিস্সালেহীনা গায়রা খায়া-য়া ওয়াল মাফতুনীন! আ-মীন এয়া রাক্বাল আলামীন]

-হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি জান আমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি। সুতরাং কবূল কর আমার ওয়রকে। আর তোমার জানা আমার চাহিদা। সুতরাং পূর্ণ করে দাও আমার যাঙ্গা। তুমি জান যে, আমার নফ্সের মধ্যে (বহু দোষ) রয়েছে। সুতরাং ক্ষমা করে দাও আমার পাপসমূহ। হে আমার রব (আল্লাহ)! নিশ্চয় আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিকট এমন ঈমানের জন্য, যা সম্পৃক্ত হয়ে থাকবে আমার কুলবের সাথে এবং এমন সাচ্চা ইয়াকুন (চাচ্ছি), যাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, যা (ভাল কিংবা মন্দ) বিষয়ের আমি সম্মুখীন হই তা আমার অদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই লিখা ছিল। এবং পূর্ণ সম্মতি দান কর তোমার নিকট থেকে সেটারই উপর, যা তুমি আমার ভাগ্যে লিখে দিয়েছ। তুমই আমার কর্ম-ব্যবস্থাপক (রক্ষক) দুনিয়ায় ও আধিরাতে। (হে আল্লাহ!) মৃত্যু দিও আমাকে ইস্লামের উপর এবং প্রবিষ্ট কর আমাকে সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের দলে। হে আল্লাহ! অবশিষ্ট রেখো না আমাদের এ স্থানে (কা'বার বদৌলতে) কোন গুনাহ, সেটা ক্ষমা না করে। এবং আমাদের সমস্ত কষ্ট সহজ করে দাও! এবং আমাদের সমস্ত চাহিদা মিটিয়ে দাও! আমাদের কাজ আমাদের জন্য সহজ করে দাও! আমাদের বক্ষ খুলে

দাও (জ্যোতি দ্বারা)! আমার অন্তরসমূহ আলোকিত করে দাও (মারিফাতের নূর দ্বারা)। প্রতিদান দাও আমাদের সমস্ত সৎকর্মের মঙ্গল ও সৌন্দর্য সহকারে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইসলামের উপরই মৃত্যু দিও। এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করিও এবং (ঘীন ও দুনিয়ায়) লাঞ্ছিত হওয়া থেকে এবং ফির্নায় পতিত হওয়া থেকেও রক্ষা করিও! কবূল কর হে সমস্ত জাহানের প্রতিপালক!

অতঃপর মুলতায়িমের পাশে আসবেন। হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বা শরীফের চৌকাঠের মধ্যবর্তীস্থানকে মুলতায়িম বলা হয়। এখন আপনি কল্পনা করুন যে, আপনি আপনার রবের ঘরের চৌকাঠে পৌঁছে গেছেন। এখনে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে আপন রবকে রাজি করান আর দিলে যা যা দোয়া আসে বলুন। হৃদয় জগতে ও দিলের সমুদ্রে ডুব দিয়ে এই কল্পনা করুন যে, আমার রব আমার সামনেই আছেন।

মুলতায়িমের দোয়া

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَيْنِيْقِ أَغْتِقْ رِقَابَ آبَائِنَا وَأَمَهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا
وَأَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجَنْدِ وَالْكَرْمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنْ وَالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ
اللَّهُمَّ أَخْسِنْ عَاقِبَتِنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجْرِنَا مِنْ خَزِيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ
الآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ مَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بِأَعْتَابِكَ
مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَأَخْشَى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا قَدِيرَمِ الإِحْسَانِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرْفَعَ ذِكْرِي وَتَضَعَ وِزْرِي وَتُصْلِحَ أَمْرِي وَتُطَهِّرَ
قَلْبِي وَتَنْوِرَ لِي فِي قَبْرِي وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ
آمِين.

[আল্লাহুম্মা এয়া রাক্বাল বায়তিল আত্মীক, আত্মিক রিকুবানা ওয়া রিকুবা আ-বাইনা ওয়া উম্মাহা-তিনা ওয়া ইখওয়ানিনা ওয়া আওলাদিনা মিনান্নার। এয়া যাল জুনি ওয়াল কারামি ওয়াল ফাদুলি ওয়াল মান্নি ওয়াল আতা-ই ওয়াল ইহ্সান। আল্লাহুম্মা আহসিন আ-কুব্বাতানা ফিল উম্রি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন বিয়মিদুনিয়া ওয়া আয়াবিল আ-বিরাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী ‘আবদুকা, ওয়া ইবনু ‘আবদিকা, ওয়া-কুফুন তাহতা বা-বিকা, মুলতায়িমু বি-আ'তা-বিকা

মুত্তায়াল্লিলুন্ বায়না ইয়াদায়কা, আরজু রাহমাতাকা ওয়া আখ্শা আয়া-বাকা
মিনাল্লারি ইয়া কৃদীমাল ইহসান। আল্লাহম্মা ইন্নী আস্মালুকা আন্ত তারফা'আ
যিক্রী ওয়া তাদা'আ ভিয়্রী ওয়া তুস্লিহা আম্রী ওয়া তুতাহহিরা কৃলবী ওয়া
তুনাভ্বিরা লী কৃবী ওয়া তাগ্ফিরা লী যাম্বী ওয়া আস্মালুকাদ দারাজা-
তিল 'উলা মিনাল জান্নাতি। আমীন!]

-হে আল্লাহ! হে মালিক (এ) প্রাচীন ঘর খানা-ই কা'বার! আযাদ কর
আমাদের গর্দানসমূহকে এবং আমাদের পিতা-পিতামহগণের
গর্দানসমূহকে এবং আমাদের মাতাগণের এবং ভাই ও সন্তানগণের
গর্দানসমূহকেও, দোষখের আগুন থেকে। হে বদান্যতার অধিকারী দাতা!
এবং অনুগ্রহশীল, দায়ালু! হে আপন বান্দাদের উপর অনুগ্রহশীল! হে
আল্লাহ! আমাদেরকে সমস্ত কর্মের শুভ পরিণতি দান কর এবং
আমাদেরকে রক্ষা কর দুনিয়ার সব লাঙ্গনা থেকে এবং আখিরাতের শাস্তি
থেকেও। হে আল্লাহ! আমি তোমারই বান্দা এবং তোমারই বান্দার
সন্তান। দণ্ডয়মান রয়েছি তোমার ঘরের দরজার ছায়াতলে, তোমার
ঘরের চৌকাঠ জাড়িয়ে ধরে, কান্নাকাটি করছি তোমারই সামনে এবং
আমি আশাবাদী তোমার রহমতের, ভীত হই তোমার দোষখের শাস্তি
থেকে! হে সর্বদা অনুগ্রহকারী! হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট
প্রার্থনা করছি যে, যেই যিক্র (অথবা হাম্দ ও সানা) করবো তা কবুল
করে উঁচু মর্যাদায় উঠিয়ে নাও! এবং হাক্কা করে দাও আমার
গুনাহসমূহের বোঝা এবং আমার কার্যাদিকে সংশোধন কর। আর পাক-
সাফ করে দাও আমার অন্তরকে। এবং আলোকিত করে দাও আমার
জন্য আমার কবরকে। আর ক্ষমা কর আমার গুনাহকে এবং প্রার্থনা
করছি (হে আল্লাহ!) তোমার নিকট থেকে জান্নাতের মধ্যে উচ্চ
মর্যাদাসমূহের জন্য। আমীন!

যমযম পান করার দোয়া

মুলতায়িম থেকে ফারেগ হওয়ার পর যমযমে আসবেন। কা'বার দিকে মুখ করে
বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে যত পানি পান করা যায় পান করবেন। শরীরেও
ঢালবেন। তারপর আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন আর এই দোয়া করবেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَشَفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

[আল্লাহম্মা ইন্নী আস আলুকা রিয়কান ওয়াসিয়াও ওয়া ইলমান নাফিয়াও ওয়া
শিফায়ান মিন কুল্লি দা-য়িন]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রশ্ন জীবিকা, উপরকারী জ্ঞান এবং
প্রত্যেক রোগের আরোগ্য কামনা করছি।

সাঁজ

যমযম পান করার পর পরই অথবা কিছুক্ষণ আরাম করার পর সাফা-মারওয়ায়
সাঁজ করার জন্যে হাজরে আসওয়াদে আসবেন এবং পূর্বোক্ত নিয়মে চুমো খাবেন।
তারপর বাবে সাফার দিকে রওয়ানা হবেন। সাফার দরজার দিকে গমনের সময়
এই দোয়া পড়বে-

أَبْدِأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
اغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ.

[আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহ তাআলা। ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন
শা'আ-ইরিল্লাহি, ফামান হাজ্জাল বায়তা আভি'তামারা ফালা জুনা-হা আলায়হি
আই ইয়াত্তাওয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাতাওয়া'আ খায়রান, ফা ইন্নাল্লাহ শা-
কিরুন 'আলীম]

-আমি শুরু করছি যেভাবে আল্লাহ তাআলা শুরু করেছেন। 'নিশ্চয়
সাফা-মারওয়া আল্লাহর নির্দশনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি
বাযতুল্লাহ শরীফের হজু বা ওমরা করে এ দু'টির মধ্যে সাঁজ করলে তার
কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি খুশি মনে সৎকাজ করবে নিশ্চয় আল্লাহ
পুরুষারদাতা ও সর্বজ্ঞ।

সাঁজের নিয়ত

যখন সাফা অভিমুখে যাত্রা করবেন তখন মনে সাঁজের নিয়ত রাখবেন আর মুখে
এই দোয়া করবেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ
فَيْسِرْهُ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنِّي.

[আল্লাহম্মা ইন্নী উরিদুস সাঁয়া বায়নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতি সবআতা
আশওয়াতিন লিওয়াজহিকাল করীমে ফাইয়াস্সিরহ লি ওয়া তাক্বাকালহ মিন্নী।]

-হে আল্লাহ! আমি সাফা-মারওয়ার মধ্যভাগে সাঁজ করার ইচ্ছা করলাম-
সাত চক্র, তোমারই মহান জাতের জন্য। সুতরাং তা আমার জন্য সহজ
করে দাও এবং তা আমা থেকে কবুল করে নাও।

সাফা পর্বতে কিবলামুখী হয়ে এই দোয়া করুন
সাফা পর্বতে এতটুকু আরোহন করুন যেন কা'বা মুআফ্যামাহ দৃষ্টিগোচর হয়।
অতঃপর কা'বামুখী হয়ে এই দোয়া করুন-

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا
أَوْلَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْهَمَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنَّ
هَدَانَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُجْزِي
وَيُمْنَى وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ
قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ أَذْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِ�يَعَادِ، وَإِنِّي
أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ
الْعَظِيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحِبِهِ وَأَتَبَاعِيهِ إِلَيْيَّ يَوْمِ
الْدِينِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَلِمَشَايِخِي وَلِلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

[আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর! ওয়া লিল্লাহিল হামদ।
আল হামদু লিল্লাহি 'আলা মা-হাদানা, আল হামদু লিল্লাহি 'আলা মা-আওলা-
না, আল হামদু লিল্লাহি 'আলা মা-আল হামানা, আল হামদু লিল্লাহিল্লায়ি
হাদানা ওয়া মা-কুন্না লিনাহ্ডানি সাও লা আন্ হাদানাল্লাহ। লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা-শারীকা লাহ লাহল মূলকু ওয়া লাহল হামদু যুহ্যী ওয়া
যুমীতু ওয়া হ্যাল লা-ইয়ামৃতু বিইয়াদিহিল খায়রু, ওয়া হ্যাল 'আলা কুল্লি
শাই়িল কুদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ, ওয়া সাদাকা ওয়া'দাহ, ওয়া
নাসারা আবদাহ, ওয়া আ'আয্যা জুনদাহ ওয়া হাযামাল আহ্যাবা ওয়াহ্দাহ,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া লা-'বুদু ইল্লা ইয়্যাহ, মুখলেছীনা লাহ্দুবীনা, ওয়া
সাও কারিহাল কা-ফিল্লান। আল্লাহমা ইন্নাকা কুলতা, ওয়া কাওলুকাল হাকী,
উদ্যু নী আসৃতাজিব লাকুম। ওয়া ইন্নাকা লাতুখলিফুল মি'আ-দ। ওয়া ইন্নি]

আসৃআলুকা কামা হাদায়তানি লিল্লাসলামী আল লা-তানয়িল্লাহু মিন্নী হাস্তা
তাওয়াহ্ফানী ওয়া আনা মুসলিমুন। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর। ওয়া লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা
বিল্লাহিল আলিয়িল আর্যাম। আল্লাহমা সাল্লি ওয়া সাল্লিম 'আলা সায়িদিনা
মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া আত্মা'ঈহী ইলা ইয়াওমিদু
দ্বীন। আল্লাহমাগ্ ফির লি ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিমাশায়িরি ওয়া লিল
মুসলিমীনা আজমা'ঈন। ওয়াস্ সালামু 'আলাল মুরসালীন। ওয়াল হামদু
লিল্লাহি রাবিল আলামীন।]

-আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর
জন্য। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন
করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ
করেছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি ইলহাম
করেছেন। সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে পথ
দেখিয়েছেন। যদি তিনি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন আমরা পথ
পেতাম না। আল্লাহ ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোন
শরীক নেই। তাঁরই জন্য সব রাজত্ব। আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি
জীবনদান করেন, মৃত্যুদান করেন। তিনি জীবিত। তাঁর কোন মৃত্যু
নেই। মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। আল্লাহ
ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক। তাঁর ওয়াদা সত্য। তিনি তাঁর
বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সৈন্যকে বিজয়ী করেছেন। ওই
একক সত্তা সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য
নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদাত করি। দ্বীন তাঁরই। যদিও
কাফিররা অপছন্দ করে। হে আল্লাহ! তুমি বলেছ, তোমার বলা সত্য।
তোমরা আমার কাছে দোয়া প্রার্থনা কর। আমি তোমাদের দোয়া কবূল
করবো। আর নিশ্চয় তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না। আর আমি তোমার
কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়ত দান
করেছ। আমার থেকে ওই হেদায়ত ছিনিয়ে নিয়ো না যতক্ষণ না তুমি
আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও। আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহর জন্য
সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
সৎকাজ করার এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার সামর্থ্য নেই। আল্লাহর
সাহায্য ছাড়া। যিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত। হে আল্লাহ!
আমাদের সরদার হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর

রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবা আর অনুসারীদের উপরও- কেয়ামত পর্যন্ত। হে আল্লাহ! আমাকে, আমার পিতা-মাত এবং আমার বুরুগণ ও সমস্ত মুসলিমানকে ক্ষমা করুন। রসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বের রব।

সাঁজ আরম্ভ করার দোয়া

নিয়ত ও দোয়া থেকে যখন ফারেগ হবেন তখন কা'বার দিকে মুখ করবেন এবং উভয় হাত তুলে প্রতিটি চক্করের শুরুতে নিজের মুখে এই দোয়া উচ্চারণ করবেন-

بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

[বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদু]

-আল্লাহর নামে আরম্ভ। আল্লাহ সর্বশেষ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই

সাফা ও মারওয়া হতে অবতরণের দোয়া

আপনি যখন সাফা অথবা মারওয়া হতে অবতরণ করবেন তখন অবতরণের সময় এই দোয়া করতে থাকবেন-

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِلْنِي بِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَأَعِذْنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتْنَةِ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

[আল্লাহম্যাস তামিলনি বিসুন্নাতি নাবিয়িকা ওয়া তাওয়াফ্ফানী আলা মিল্লাতিহি ওয়া আ'য়িয়নী মিন মুদ্বাল্লাতিল ফিতানি, বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন]

-হে আল্লাহ! আমাকে তোমার নবীর সুন্নাতের অনুসারী করে দাও। এবং আমাকে তাঁর দ্বিনের উপর মৃত্যু দাও। আর আমাকে আশ্রয় দাও পথপ্রস্তকারীর ফিতনাসমূহ থেকে তোমারই রহমত দ্বারা, হে সর্বাপেক্ষা দয়ালু।

মারওয়ার দিকে যাওয়ার সময় এই দোয়া করবেন

সাফার সিঁড়ি বেয়ে নেমেই আপনার সফর সূচনা হবে মারওয়া অভিমুখে। তাই মারওয়ার দিকে যাত্রা করতে এই দোয়া মুখে রাখুন-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

[সুবহানাল্লাহি ওয়াল্লাহি লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আয়ীম]

-আল্লাহ তাআলা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্ত। আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযোগি নয়। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়। নেই ক্ষমতা সৎকাজ করার, না গুনাহ থেকে বাঁচার আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত, যিনি খুবই উচ্চ মর্যাদাশীল ও মহান।

যদি উক্ত দোয়া আপনার মুখস্থ না থাকে তা হলে যে কোনো দোয়া যেমন- সুবহানাল্লাহ, আলহামদুল্লাহ, আল্লাহ আকবার, ইস্তিগফার বা দরংদ শরীফ ইত্যাদির যিকির চালু রাখবেন।

মীলাইনে আখ্যারাইন

আপনি যখন সাফা হতে মারওয়ার দিকে যাত্রা করবেন তখন সামান্য দূরে দুটি সবুজ টিউবলাইটে আপনার দৃষ্টি পড়বে। ওই টিউবদ্বয়ের মধ্যবর্তী জায়গা সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে নিম্নাঞ্চল ও হ্যারত ইসমাইল আলাইহিস সালাম দৌড়ে অতিক্রম করেছিলেন। আল্লাহ রাবুল ইজ্জতের নিকট তাঁর এই কাজটি এত বেশী পছন্দ হয়েছিলো যে, আজও যখন কোনো হাজুরী এই পথে যায় তবে তাকে (পুরুষকে) একটু দৌড়ে চলার নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় মীল থেকে বের হবেন তখন ধীরে যাবেন। মীলাইনে আখ্যারাইনের মাঝখানে এই দোয়া পড়বেন-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاجْوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ
الْأَكْرَمُ وَاهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا
وَذَنْبِي مَغْفُورًا. اللَّهُمَّ اغْفِرِي وَلِوَالِدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعْوَاتِ رَبِّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ.

[রাবিগ্ফির ওয়ারহাম্ ওয়া তাজাওয়ায় 'আম্মা তালামু ইন্নাকা আন্তা তালামু মা-লাম নালাম। ইন্নাকা আন্তাল আ'আয়ুল আকরাম। ওয়াহদিনী

লিঙ্গাতী হিয়া আকৃত্যাম। আল্লাহ হাজ্জাম্ মাবক্রাওঁ ওয়া
সা'ইয়াম্ মাশ্কুরাওঁ ওয়া যাম্বাম্ মাগফুরা। আল্লাহস্মাগ্ ফিরলী ওয়া
লিউয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি ওয়াল মুস্লিমীনা
ওয়াল মুস্লিমাতি এয়া মুজীবাদ্দাওয়া-ত রাক্বানা আ-তিনা ফিদুনিয়া
হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- আযাবান্নার।]

-হে আমাদের রব! আমায় ক্ষমা কর এবং দয়া কর। এবং ক্ষমা কর তা
যা তুমি জান। নিশ্চয় তুমি জান তাই যা আমরা জানি না। নিশ্চয় তুমি
মহান সম্মানিত। আমাদেরকে দেখাও ওই পথ যা অত্যন্ত সরল। হে
আল্লাহ! আমার এ হজু কবৃলকৃত, প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞকৃত এবং আমার
গুনাহগুলোকে ক্ষমাযোগ্য কর। হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমাদের
মাতা-পিতা ও সকল মুসলমান-মু'মিন নরনারীকে ক্ষমা কর। হে
প্রার্থনাসমূহ কবৃলকারী! হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়া ও
আধিরাতে কল্যাণ দান কর। এবং দোয়খের আগুন থেকে রক্ষা কর।

সাফা-মারওয়ার চক্রের নির্দিষ্টতা

সাফা-মারওয়ায় চক্রের সংখ্যা কীভাবে পরিপূর্ণ করা যাবে সে ব্যাপারে মনে
রাখবেন- সাফা থেকে মারওয়াহ যাওয়াকে এক চক্র বলে, মারওয়া থেকে
সাফায় আসাকে আরেক চক্র, তারপর সাফা থেকে মারওয়ায় যাওয়াকে তৃতীয়
চক্র আর মারওয়া থেকে সাফা যাওয়া চতুর্থ চক্র বলা হয়। এভাবে সপ্তম চক্র
মারওয়ায় এসে শেষ হবে।

নোট : যখন মারওয়ায় পৌছবেন তখন সেখানে পৌছেই সেই আমল করবেন যা
সাফায় করেছিলেন। অর্থাৎ অল্প হাত উত্তোলন করে কিবলামুখী হয়ে দোয়া
করবেন। বিনা কোনো কারণে অধিক উপরে আরোহন করা উচিত নয়।

হলক বা কসর এবং ওমরার সম্পূর্ণকরণ

যখন সপ্তম সাঁই মারওয়ায় গিয়ে সমাপ্তি হয় তখন ওমরার সকল কাজকর্ম শেষ
হয়ে যায়। এখন উচিত, মসজিদে হারামের বাইরে আসা। পুরুষ ভাইয়েরা হলক
(তথা পুরো মাথা মুণ্ডানো) বা কসর (কিছু কর্তন করা) করবেন আর মহিলাগণ
মাথার পশ্চাত অংশ থেকে এক অঙ্গুল পরিমাণ কর্তন করে নিবেন।

ইহরাম খুলে ফেলা

হলক বা কসর করার পর নিজের বাসায় গিয়ে ইহরামের পরিধেয় বন্ত্র খুলে ফেলা
যায়। তবে কারিন আর মুফরিদ (যিনি ইফরাদ করেছেন) লাক্বাইক বলে ইহরাম

সহকারে মক্কায় অবস্থান করবেন। কিন্তু যিনি তামাতু করেছেন তিনি এবং শুধুমাত্র
ওমরা পালনকারী তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদের চুমু থেতেই লাক্বাইক
বলা হেড়ে দিবেন। তাওয়াফ ও সাঁদ্রের পর হলক বা কসর করবেন এবং ইহরাম
থেকে বেরিয়ে যাবেন। মিনায় যাওয়ার জন্যে অষ্টম তারিখের জন্য সবাই মক্কা
মুকাররামায় অপেক্ষা করবেন।

একটি শুরুত্বপূর্ণ কথা

ওমরা আলাদাভাবে করা হোক কিংবা পৃথক করা হোক উভয়ের অধিকাংশ হকুম,
নিয়মকানুন এক ও অভিন্ন। তেমনিভাবে হজুর তাওয়াফ ও সাঁদ্রের মৌলিক নিয়ম
পদ্ধতিও ওই সব যা ওমরার আছে। তাই মানাসিকে হজুর আদায়কালে যেখানে
তাওয়াফ ও সাঁদ্রের আলোচনা আসবে সেখানে মানাসিকে ওমরায় বিধৃত সে সব
বিস্তারিত বিবরণ আরেকবার পাঠ করে নিবেন।

সপ্তম অধ্যায়

মানাসিকে হজু (হজুর পালনীয় কাজসমূহ)

আট যিলহজুর পুণ্যময় ও সোনালী ভোর থেকে হজুর সূচনা হয়। এখন সামনের পাঁচদিন (হজুর দিনসমূহ) পুরো সফরের সারবস্ত। তাই এই সুমহান দিনগুলির সকল আহকাম ও বিস্তারিত তথ্যজ্ঞান আপনার জানা থাকা চাই। এখন আমরা সেই পাঁচদিনের যাবতীয় করণীয় সম্পর্কে ক্রমানুসারে বর্ণনা করব যাতে হাজুগণ এসব দিবসে বেশী থেকে বেশী উপকৃত হতে পারেন।

হজুর পাঁচদিন ব্যাপী প্রোগ্রামের ক্রমবিন্যাস

১. ইয়াওমুন্তারবিয়া (হজুর প্রথম দিবস- ৮ যিলহজু)

গোসল ও ইহরাম

ওই দিন আপনি খুব ভোরে ওঠার চেষ্টা করবেন। ওঠেই সর্বপ্রথম সুন্নাত মুতাবেক গোসল করবেন। গোসল যদি সম্ভব না হয় তা হলে ভালভাবে অজু করবেন। এই গোসল বা অজু করার সময় ইহরামের নিয়তও করে নিবেন। অতঃপর মাসনূন তরীকায় ইহরাম পরে দু'রাকাত নফল পড়বেন। যখন ফজরের নামাযের সময় হবে তখন চেষ্টা করবেন যেন ফজরের নামাযটি মসজিদে হারামে আদায় করায়। ওখানে বসে হজুর নিয়তও করবেন।

হজুর নিয়ত

*اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنِّي، وَأَعْنِي عَلَيْهِ وَبَارِكْ لِي فِيهِ، نَوْتُ
الْحَجَّ وَأَخْرَمْتُ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى.*

[আল্লাহমা ইন্নী উরীদুল হজ্জা। ফাইয়াসসিরহ সী ওয়া তাক্বাক্বালহ মিন্নী।
ওয়া আইন্নী আপায়হি ওয়া বারিক সী ফী-হি নাওয়াতুল হাজ্জা ওয়া আহরামতু
বিহি লিল্লাহি তাআলা]

-হে আল্লাহ! আমি হজুর ইচ্ছা করছি, অতএব তা আমার জন্য সহজ
করে দাও। এবং তা আমা থেকে কবূল কর। আর এতে আমাকে সাহায্য
কর। তাতে আমার জন্য বরকতদান কর। আমি হজুর নিয়ত করছি।
এবং সে সাথে আল্লাহ তাআলার জন্য ইহরাম বাঁধছি।

তালবিয়া

হজুর নিয়ত করার পর পরই অন্ন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন, আর নিম্নকণ্ঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পড়বেন।

*لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ.*

[লাক্বায়কা আল্লাহমা লাক্বায়কা, লাক্বায়কা লা শরীকা লাকা লাক্বায়কা,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শরীকা লাক]

-আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই।
আমি উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই জন্য। রাজতু
তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।

তাওয়াফে কুদূম

মিনায় রওয়ানা দেওয়ার আগে তাওয়াফে কুদূম (আসার তাওয়াফ) করবেন। আর স্মরণ রাখা চাই যে, তাওয়াফ ও সাঁউর দোয়া ও নিয়মকানূন ঠিক ওই সব যা
ছিলো ওমরারও। তাই মানাসিকে ওমরার অধ্যায়ে তা ইয়াদ করে নিলে ভালো
হবে।

মিনায় রওয়ানা

তাওয়াফে কুদূম শেষ করে মিনার দিকে রওয়ানা দিবেন। মিনা মক্কা উপত্যকা
থেকে প্রায় ৩ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত। মিনার দিকে যাওয়ার প্রাক্তলে পথে
তালবিয়া, যিকির-আয়কার ও ইস্তিগফার বেশী বেশী পাঠ করতে থাকবেন। সাথে
সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদও পড়তে থাকবেন।
মিনায় আপনি যুহুর আসর মাগরিব ইশা এবং নবম যিলহজুর ফজরের নামায
আদায় করবেন। মিনায় রাত্যাপন করা সুন্নাত। আর উত্তম হল রাত্রেও বেশী
বেশী তালবিয়া ও ইস্তিগফারসহ অন্যান্য দোয়াসমূহ পড়তে থাকবেন।

মিনায় পড়ার দোয়া

আরাফার রাত্রিতে মিনা উপত্যকায় এই দোয়া করা উচিত-

سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِئُهُ، سُبْحَانَ

الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي

الْجَنَّةَ رَحْمَتُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُوْرِ قَضَاؤُهُ اسْبَحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ
رُوحُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ، سُبْحَانَ
الَّذِي لَا مُلْجَأَ وَلَا مُنْجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ.

[সুবহানাল্লায়ি ফিস সামায়ি আরঙ্গু, সুবহানাল্লায়ি ফিল আরদি মওতিউহু,
সুবহানাল্লায়ি ফিল বাহরি সবিলুহু, সুবহানাল্লায়ি ফির নারে সুলতানুহু,
সুবহানাল্লায়ি ফিল জান্নাতে রাহমাতুহু, সুবহানাল্লায়ি ফিল কুবুরে কাদাউহু,
সুবহানাল্লায়ি ফিল হাওয়ায়ে রুহুহু, সুবহানাল্লায়ি রাফায়াস্ সামায়া,
সুবহানাল্লায়ি ওয়াদাআল আরদা, সুবহানাল্লায়ি লা-মালজাআ ওয়া লা মানজাআ
ইল্লা ইলাইহি]

-পবিত্র মহান ওই জাত, যাঁর আরশ আসমানে। পবিত্র ও মহান ওই
জাত, যাঁর চারণভূমি রয়েছে যমীনে। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যাঁর
রাস্তা রয়েছে সমুদ্রে। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যাঁর শাস্তিদানের
ক্ষমতা প্রকাশ পায় দোষখের আগুনে। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যাঁর
রহমত রয়েছে জান্নাতে। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যাঁর শেষ নির্দেশ
প্রকাশ পায় কবরে। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যাঁর সৃষ্ট রূহ রয়েছে
বাতাসের মধ্যে। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যিনি আসমানকে উঁচু
করেছেন। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যিনি যমীনকে নিচে স্থাপন
করেছেন। পবিত্র ও মহান ওই জাত, যিনি ব্যতিত অন্যকোন আশ্রয়স্থল
ও মুক্তি পাবার স্থান নেই।

২. ইয়াওমে আরফা (হজ্জের দ্বিতীয় দিবস ৯ ফিলহজ্জ)

হজ্জের দ্বিতীয় দিন অন্যসব দিবস অপেক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়। এটি
মাগফিরাতের দিন। তাকে ইয়াওমে আরাফাও বলা হয়। এদিন হজ্জের মহান
রুকন (ওকূফে আরাফাত) পালিত হয়।

আরাফাতের দিকে গমন

ফজরের মুস্তাহাব ওয়াকে নামায আদায় করে সূর্যের আভা দেখা যেতেই
আরাফাতের দিকে রওয়ানা দিবেন। যাত্রাপথে অধিকহারে দরদ শরীফ ও
লাক্বাইক ধ্বনি উচ্চারিত করবেন। আরাফাতে যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়বেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي تَوَجَّهُ إِلَيْكَ تَوَكِّلُ عَلَيْكَ أَرَدَتُ فَاجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا
وَحَجَّيْ مَبْرُورًا وَإِذْخَنِي وَلَا تُخْبِنِي وَبَارِكْ لِي فِي سَفَرِي وَاقْضِ بِعَرَفَاتِ
حَاجَتِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

[আল্লাহম্বা ইলাইকা তাওয়াজ্জাহতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া
ওয়াজহাকা আরদুহু ফাজআল যমবী মাগফুরা ওয়া হজ্জী মাবরুরা ওয়ারহামনী
ওয়ালা তুখিয়িবনী ওয়া বারিক লি ফি সফরী ওয়াকদি বিআরাফাতিন হাজতী
ইন্নাকা আলা কুলি শাইয়িন কুদির]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি মুখ করেছি। তোমার উপর ভরসা
করছি। এবং তোমার মনোনিবেশের প্রার্থী। আমার গুনাহ ক্ষমা কর।
আমার হজ্জকে মকবুল হিসেবে পরিণত কর। আমার উপর দয়া কর।
আমাকে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে দিও না। আমার সফরে বরকত দান কর।
আর আরাফাতে আমার অভাব পূরণ কর। তুমি প্রত্যেক বক্তুর উপর
ক্ষমতাবান।

আরাফাতে প্রবেশ করার দোয়া

আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করার সময় আল্লাহ জাল্লা শানুহূর তাসবীহ, তাহমীদ
পাঠ করবেন এবং মুখে এই দোয়াটি পড়বেন-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَكْبَرُ

[সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবর]

-আল্লাহ পবিত্র! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন
উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান।

যখন আপনি আরাফাতে প্রবেশ করে ফেলবেন তখন জাবালে রহমতের পাশে বা
যেখানে সুযোগ হয় রাস্তা থেকে সরে অবস্থান করবেন এবং দ্বিতীয় যাবত
বেশীক্ষণ ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া ও কান্নাকাটি করবেন, সদকা-খয়রাত ও
যিকির-আয়কার এবং লাক্বাইকে মশগুল থাকবেন।

আরাফাতে অবস্থানের দোয়া

দ্বিতীয় হতেই চেষ্টা করবেন যেন মসজিদে নমিরায যেতে পারেন এবং যুহর ও
আসর একসঙ্গে মসজিদে নমিরায গিয়ে পড়তে পারেন। নামায শেষ করেই
মাওকিফের পানে রওয়ানা দিবেন তা আল্লাহর বিশেষ রহমত অবতরণের স্থান।

এখানে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে যেভাবই হোক দোয়া করবেন। আপন দয়াময় রবের দরবারে হাত তোলে তাকবীর, তাহলীল, হামদ, যিকর, দোয়া ও তাওবা ইত্যাদিতে নিমগ্ন থাকবেন। কেননা, এই অবস্থানই হল হজ্জের প্রাণ ও বড় গুরুত্বপূর্ণ রূক্ষণ।

এখানে এসে তাজেদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভুলবেন না। কেননা তিনি আমাদেরকে এই মরু-প্রান্তরে ভোলেন নি। তাই তাঁর উপর খুব বেশী বেশী দরদ ও সালাম পেশ করবেন। তাছাড়া পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, মাতৃভূমি, ইসলামের সম্মানের সুরক্ষা ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্যও দোয়া করবেন। সম্ভব হলে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবেন-

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِنِي
وَاغْتَصِّنِي بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا
وَذَنْبًا مَغْفُورًا اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَحَجْيَابِي وَمَكَابِي وَإِلَيْكَ مَا لِلَّهِمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسُوءِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا
بِالْهُدَى وَزِينَا بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا
حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا اللَّهُمَّ أَمْرِنِي بِالدُّعَاءِ وَلَكَ الإِجَابَةُ وَإِنِّي لَا تَخْلِفُ
وَعْدَكَ اللَّهُمَّ مَا أَخْبَيْتَ مِنْ خَيْرٍ فَاجْهِهِ إِلَيْنَا وَيَسِّرْهُ لَنَا وَمَا كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ
فَكَرِهْهُ إِلَيْنَا وَجَنَبْنَا عَنْهُ وَلَا تَنْزِعْ مِنَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْبِي وَيُمِنْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَخْ لِي
صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَتَشَتِّتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ
الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلْجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلْجُ فِي النَّهَارِ وَشَرِّ
مَا تُهِبُّ بِهِ الرَّيْاحُ وَمِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةً وَفِيَّ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نِيَّكَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرَيْتِي رَبَّنَا وَتَقْبَلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّ ارْجِعْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا صَغِيرِاً رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرَانِا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلَالًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ
رَحِيمٌ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ
الرَّحِيمُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي تَعْلَمُ وَتَرَى مَكَانِي
وَتَسْمَعُ كَلَامِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّتِي وَلَا يَخْفِي عَلَيْكَ شَيْئٌ مِنْ أَمْرِي وَأَنَا
الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغْيِثُ الْمُسْتَحِيرُ الْوَجْلُ الْمُشْفِقُ الْمُقْرُ الْمُغْرِبُ بِذَنْبِيْهِ أَسْأَلُكَ
مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ وَابْتَهَلُ إِلَيْكَ بِذَنْبِ الْمُذْنِبِ الْمُذْلِلِ وَادْعُوكَ دُعَاءَ الْخَافِفِ
الضَّرِيرِ مَنْ خَضَعْتَ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَنَحِلَّ لَكَ جَسَدُهُ وَرَغْمَ لَكَ
أَنْفُكَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيقًا وَكُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْتُولِينَ وَيَا
خَيْرَ الْمُعْطَيِّنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ يَا مَنْ لَا يُرِيهِ
الْحَاجُ الْمُلْحِينُ فِي الدُّعَاءِ وَلَا تَضْحِرُهُ مَسْأَلَةُ السَّائِلِينَ أَذْقَنَا بِرَزْدَ عَفْوِكَ
وَحَلَاؤَهُ مَغْفِرَتِكَ وَلَذَّةَ مَنَاجَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ إِلَيْهِي مَنْ مَدَحَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ فَإِنِّي
لَا يَمِنْ نَفْسِي أَخْرَسَتِ الْمَعَاصِي لِسَانِي قَمَالِي وَسِيلَةٌ مِنْ عَمَلِي وَلَا شَفِيعٌ يَسُوئِي
الْأَمْلِ.

-আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ।
ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা
শরীকালাহু লালু মুল্কু ওয়া লালু হাম্দ। আল্লাহমাহদিনী বিল্হুদা। ওয়া

নাকুলিনী ওয়া'তসিম্নী বিস্তারক্তওয়া ওয়াগফিরলী ফিল আ-বিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহমাজ'আল্লু হাজ্জাম্ মাব্কুরাওঁ ওয়া যাম্বাম্ মাগফুর। আল্লাহমা লাকা সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্যা-য়া ওয়া মামাতী। ওয়া ইলায়কা মাআলী। আল্লাহমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আয়া-বিল ক্তাবরি ওয়া ওয়াস্তুওয়াসাতিস্ সদৰি ওয়া শাতাতিল আমরি। আল্লাহমাহ দিনা বিল্হুদা ওয়া যাইয়িন্না বিস্তারক্তওয়া। ওয়াগফিরলানা ফিল আ-বিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহমা ইন্নী আস্তালুকা রিয়ক্তান্ হালা-লান্ তৈয়্যবাম্ মুবারকা। আল্লাহমা আমারতানী বিদো'আ-ই ওয়ালাকাল ইজাবাতু। ওয়া ইন্নাকা লা-তুখলিফু ওয়া'দাকা। আল্লাহমা মা-আহবাব্তা মিন খাইরিন ফা আহিব্বাহ ইলায়না ওয়া ইয়াস্সিরহ লানা। ওয়ামা কারিহতা মিন শার্বিন ফা কার্বিহল ইলায়না ওয়া জান্নিবনা 'আন্হ ওয়ালা-তান্ধি' মিন্নাল ইস্লামা বাদা ইয় হাদায়তানা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা শরীকালাহ লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু, ইউহ্যী ওয়া ইউমীতু ওয়াহ্যা 'আলা কুলি শায়ইন কৃদীর। আল্লাহমাজ'আলা ফী সদৰী নূরাওঁ ওয়া ফী সাম্ভে নূরাওঁ ওয়া ফী বাসারী নূরাওঁ ওয়া ফী কৃলবী নূরান। আল্লাহমাশুরাহ্লী সদৰী ওয়াস্সির লী আমরী; ওয়া আ'উযু বিকা মিন ওয়াসাতিস্স সদৰি ওয়া তাশাতুতিল আমরি ওয়া আয়াবিল ক্তাবরি। আল্লাহমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্বিন মা-ইয়ালিজু ফিল্লায়লি ওয়া শার্বিন মা ইয়ালিজ ফিল্লাহা-রি, ওয়া শার্বিন মা তুহিবু বিহির রিয়াহ, ওয়া শার্বিন বাওয়াইক্তিদ দাহরি। রাক্বানা আ-তিনা ফিল্লিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-বিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্লিন আয়াবান্নার। আল্লাহমা ইন্নী আস্তালুকা মিন খায়রি মা সাআলাকা বিহী নাবিয়ুকা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামা। ওয়া 'আয়ু বিকা মিন শার্বিন মাস্তা'আয়াকা মিনহ নাবিয়ুকা সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাক্বানা যালামনা আনকুসানা ওয়াইল্লাম তাগ্ফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনানা মিনাল খা-সিরীন। রাক্বিজ'আল্লী মুক্তীমাস সালাতি ওয়ামিন মুররিয়াতী রাক্বানা ওয়া তাক্তাকাল দো'আ। রাক্বানাগ্ফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল-মু'মিনীনা ইয়াউমা ইয়াকুমুল হিসা-ব। রাক্বিল্লামহম্মা কামা রক্বায়া-নী সাহী-রা। রক্বানাগ্ফিরলানা ওয়া লিইখ'ওয়ানিনাল্লায়ীনা সাবাকুলা বিল ঈমানি ওয়াল তাজ'আল ফী কুলুবিনা গিল্লাল্লায়ী-না আ-মানু রাক্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা রাউফুর রাহীম। রাক্বানা ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম ওয়াতুব 'আলায়না ইন্নাকা আন্তাস্তাওয়াবুর রাহীম। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়িল 'আযীম। আল্লাহমা ইন্নাকা তালামু সির্বি ওয়া 'আলা-নিয়াতী ওয়া লা ইয়াখফা আলায়কা শায়উম্ মিন আমৰী ওয়া আনাল বা-ইসুল ফক্তীরুল মুস্তাগীসুল মুস্তাজীরুল ওয়াজিলুল মুশফিকুল মুক্তিরুল মু'তারিফু বিয়াবিহী, আস্তালুকা মাস্তাপাতা মিস্কীনি ওয়া আব্তাহিলু ইলায়কা ইবতিহা-লাল

মুয়নিবিয় যালী-লি ওয়া আদ'উকা দো'আ আল খা-ইফিদু দারীরি মান্খাদা'আত লাকা রাক্তবাতুহ ওয়া ফা-দাত আয়না-হ ওয়া নাহিলা লাকা জাসাদুহ ওয়া রাগিমা লাকা আনকুহ। আল্লাহমা লা তাজ'আল্লী বিদো'আ-ইকা শাক্তিয়াওঁ ওয়াকুন্লী রাউফার রাহীমান। এয়া খায়রাল মাস্তুলীনা ওয়া এয়া খায়রাল মু'তীনা এয়া আরহামার রা-হিমীনা ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাক্বিল আলামীন। আমীন। এয়া মান্লা-ইউব্রিমুহ ইলহাল্ল মুল্লীনা ফীদো'আ-ই ওয়া তাদজিরহ মাগফিরাতিকা ওয়া লায়থাতা মুনা-জা-তিকা ওয়া রাহমাতিকা। ইলা-হী মাম্ মাদাহ ইলায়কা নাফসাল ফা-ইন্নী লা-ইযু নাফসী আব্রাসাতিল মা'আসী লিসা-নী ফামা-লী ওয়াসী-লাতুম্ মিন 'আমালিন ওয়ালা-শাফী-'উন সিওয়াল আমাল।

-আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজ্য ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই নিমিত্ত। হে আল্লাহ! আমাকে সৎপথ প্রাণ কর। আমাকে (পাপসমূহ থেকে) পবিত্র করে দাও। আমাকে পরিপূর্ণ পরহেয়গার করে দাও! আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা করে দাও! হে খোদা! আমার এ হজুকে কবূল কর এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও! হে আল্লাহ! আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও মরণ তোমারই জন্য। শেষ পর্যন্ত আমার প্রত্যাবর্তনও তোমারই দিকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের শাস্তি, অন্তরের প্ররোচনা ও মামলাসমূহের পেরেশানী থেকে। হে আল্লাহ! হিদায়ত সহকারে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন কর। আমাদেরকে পরহেয়গারী দ্বারা সজ্জিত কর। আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা করে দাও! হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হালাল, পবিত্র ও বরকতময় রূজী প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দো'আ করার নির্দেশ দিয়েছ, কবূল করা তোমারই ইখতিয়ারে। বস্তুতঃ তুমি ওয়াদার বরখেলাফ কর না। হে আল্লাহ! তুমি যেই মঙ্গলকে পছন্দ কর সেটাকেই আমাদের নিকট প্রিয় করে দাও। এবং তা আমাদের জন্য সহজ করে দাও! আর যেই অঙ্গলকে তুমি অপছন্দ ক'র, সেটা আমাদের নিকটও অপছন্দনীয় করে দাও। এবং সেটাকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ। আমাদের নিকট থেকে ইসলামকে ছিনিয়ে নিওনা এর পর যে, তুমি আমাদেরকে হিদায়ত করেছ। আল্লাহ ব্যতিত অন্য

কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সব রাজ্য ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি যা চান করতে পারেন। হে আল্লাহ! আমার বক্ষ খুলে দাও। আমার মামলাগুলোকে সহজ করে দাও। আমি বক্ষের প্ররোচনা, কার্যাদির অসম্পূর্ণতা ও কবরের শান্তি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ওই বস্ত্র অনিষ্ট থেকে, যা রাতে প্রবেশ করে এবং ওই বস্ত্র অনিষ্ট থেকে, যা প্রবেশ করে দিনের বেলায় এবং ওই বস্ত্র অনিষ্ট থেকে যাকে বাতাস উড়ায় এবং যুগের দুর্ঘটনাবলীর অনিষ্ট থেকেও। হে আল্লাহ! আমার বক্ষদেশ, কান, চক্ষু ও অন্তরকে নূরে ভর্তি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়া ও আধিরাতের মঙ্গল দান কর এবং দোষখের শান্তি থেকে বঁচাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ওই মঙ্গল চাচ্ছি, যা তোমার নিকট তোমার নবী চেয়েছেন। আর ওই বস্ত্র অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপন প্রাণের প্রতি জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি দয়াপরবশ না হও, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী করে দাও এবং আমার আওলাদকেও। হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং মু'মিনদেরকে কৃয়ামত-দিবসে। হে আমাদের রব! দয়া কর ওই দু'জনকে (মাতাপিতা), যেমনিভাবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন শিশু থাকাবস্থায়। হে আমাদের রব! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের ওই ভ্রান্তবৃন্দকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান সহকারে গত হয়ে গেছে। এবং ঈমানদ্যুরগণের সম্পর্কে আমাদের অন্তরকে বিদ্বেষমুক্ত কর। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি দয়ালু, দায়ার্দ। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ এবং আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর (তাওবা কৃত কর)। নিশ্চয় তুমি তাওবা কৃতকারী, মহান দয়ালু। নেই শক্তি সৎকর্ম করার, না গুনাহ থেকে বঁচার আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে, যিনি মহান। নিশ্চয় তুমি জান এবং আমার অবস্থানের স্থান দেখছো, আমার কথা শুনছ, আমার যাহের ও বাতেন সম্পর্কে জান। আমার কোন কাজই তোমার নিকট গোপন নেই। আমি অতীত গরীব সাহায্যপ্রার্থী ও একজন অভাবী লোক হই, আশ্রয় প্রার্থী হই, ভীত হই।

আপন গুনাহ স্বীকার করছি। আমি তোমার নিকট মিস্কিন-ফকীরের ন্যায় যাঙ্গা করছি। একজন লাঢ়িত পাপীর ন্যায় তোমার সম্মুখে কান্নাকাটি করছি, এমন একজন ভীতসন্দ্রস্ত অন্দের ন্যায় তোমার দরবারে দোআ প্রার্থনা করছি। যার গর্দান তোমার জন্য ঝুঁকেছে, চক্ষুদ্বয় অকাতরে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, যার শরীর (তোমার স্মরণে) শীর্ণকায় হয়ে গেছে, যার নাক তোমারই জন্য ধূলীময় হয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সামনে দোআ প্রার্থনা করা সত্ত্বেও হতভাগ্য করো না। তুমি আমার প্রতি দয়ার্দ, দাতা হয়ে যাও। হে সর্বোৎকৃষ্ট যাচিত সত্ত্ব! হে সর্বোভূম দাতা! হে সর্বাপেক্ষা মহান দয়ালু! এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের রব! কৃতুল করে নিন! হে ওই মহান জাত! যাঁকে নারায় করে না বারংবার ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ; যাঁকে বিরক্ষ করে না যাঙ্গাকারীদের যাঙ্গা। আমাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দাও তোমার ক্ষমার; এবং তৃষ্ণি দাও তোমার মাগফিরাতের এবং মজা দাও তোমার দরবারে সবিনয় প্রার্থনা ও রহমতের। হে আল্লাহ! যে আপন নাফ্সের প্রশংসা করে তোমার সামনে (সে করছেই); কিন্তু আমি তো নিশ্চয়ই আপন নাফ্সের মন্দ সমালোচনাকারী হই; অথচ পাপসমূহ আমার জিহ্বাকে বোবা-বাকহীন করে দিয়েছে। অতএব, আমার আমল বা কর্মসমূহের কোন ওসীলা বা মাধ্যম নেই, নেই কোন সুপারিশকারী, একমাত্র আশা ব্যতীত।

মুয়দালিফায় যাত্রা ও রাত্রি যাপন

সূর্য যখন নিশ্চিত অস্ত যাবে তখনই মুয়দালিফার (আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী ময়দান) দিকে রওয়ানা দিবেন। কিন্তু তবে ইমামের আগে আরাফাত থেকে বের হবেন না। পথিমধ্যে যিকর-আয়কার, দোয়া-দরূদ ও লাক্বাইকে মশগুল থাকবেন। মুয়দালিফায় যাওয়ার পথে এই দোয়াটি পাঠ করবেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْصَطْتُ وَمِنْ عَذَابِكَ أَشْفَقْتُ وَإِنِّي رَغِبْتُ وَمِنْ سَخْطِكَ
رَهِبْتُ فَاقْبِلْ نُسُكِيْ وَأَعْظِمْ أَجْرِيْ وَتَقْبَلْ تَوْبَتِيْ وَارْحَمْ تَضَرُّعِيْ وَاسْتَحْبِ
دُعَائِيْ وَأَعْطِيْ سُؤَالِيْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

[আল্লাহমা ইলাইকা আফাজতু ওয়ামিন আয়াবিকা আশুফাকতু ওয়া ইলায়কা রাগিবতু ওয়ামিন সাখাতিকা রাহিবতু ফাকবিল নুসুকী ওয়া আ'যিম আজরী ওয়া

তাক্তাকাল তাওবাতী ওয়ারহাম তাদারলুমী ওয়াস্স-তাজিব দোয়ায়ী ওয়া
আ'-তি সুওয়ালী ইয়া আরহামার রাহিমীন]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তোমার শান্তিকে
ভয় করছি। এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তোমার গবেষণ থেকে
ভয় করছি। অতএব হে আল্লাহ! আমার হজু কবৃল কর এবং তারপর
অশেষ সাওয়াব দান কর। আমার তাওবা কবৃল কর। তুমি আমার
কান্নাকাটির উপর দয়া কর। আমার দোয়া-প্রার্থনা কবৃল কর। আমার
চাওয়া পূরণ কর। হে সর্বাপেক্ষা মহান দয়াবান।

যখন আপনি মুয়দালিফায় পৌছে যাবেন তখন মুয়দালিফা-প্রান্তরের শেষ প্রান্তে
একটি পাহাড় আপনার নজর কাঢ়বে, যাকে মাশআরে হারাম বলা হয়। চেষ্টা
করবেন যেন মাশ'আরে হারামের আশে-পাশে অবস্থান করতে পারেন। না হয়
মুয়দালিফা-সীমানায় যেখানেই সম্ভব হয় অবস্থান নিতে পারেন। এখানে পৌছে
ইশার সময় মাগরিব নামায যতদূর সম্ভব ইমামের সাথেই পড়বেন। ফরজের
সালামের পর একসঙ্গে ইশার নামাযও পড়ে নিবেন। এরপর মাগরিব ও ইশার
সুন্নাতসমূহ ও বিতর পড়বেন।

মুয়দালিফায় পুরো রাত জেগে থাকা চাই। রাতভর নামায, তিলাওয়াত, দোয়া-
যিকির ইত্যাদিতে থাকা উচিত। এই রাতটি লায়লাতুল কদরের চেয়ে উত্তম।
এখানে এই দোয়াটি পড়তে পারেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرْزَقَنِي فِي هَذَا الْمَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَنْ تَصْرِفَ
عَنِّي السُّوءَ كُلِّهِ فَإِنَّهُ لَا يَفْعُلُ ذَلِكَ غَيْرُكَ وَلَا يَجِدُ بِهِ إِلَّا نَتَ.

[আল্লাহভ্য ইন্নী আস্আলুকা আন তুরযাকানী ফি হায়াল মাকানি জওয়ামিআল
খায়রি কুল্লিহি, ওয়াআন তাসুরিফা আন্নীস্ সু-আ কুল্লাহ ফাইল্লাহ লা
ইয়াফআলু যালিকা গায়রুকা ওয়ালা ইয়াজুদু বিহি ইল্লা আনতা]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ বিষয়ের জন্য যাঞ্ছা করছি যে, দান
কর আমাকে এ পবিত্র স্থানে সমস্ত নেকীর সমষ্টি আর দুর করে দাও
আমার মধ্য থেকে সমস্ত মন্দ বন্ধ। সূতরাং এ কাজ তুমি ছাড়া অন্য কেউ
করতে পারে না। এবং না তুমি ব্যক্তিত অন্য কেউ তা দান করতে পারে।

ইয়াওমে নাহর (হজুর তৃতীয় দিবস- ১০ ফিলহজু)

হজুর তৃতীয় দিন ঈদুল আযহা উদযাপিত হয়। কিন্তু হাজীদের ব্যস্ততা ও ওই
দিনের মানাসিকে হজুর গুরুত্বের কারণে হাজীরা ঈদের নামায হতে বাদ
থাকেন।

মুয়দালিফায় অবস্থান

১০ ফিলহজু ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মুয়দালিফায় অবস্থান করা
আবশ্যিক। মুয়দালিফায় অবস্থানকালে ফজরের নামাযের পর এই দোয়া করা চাই-

اللَّهُمَّ بَلْغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِّنَ التَّجْيِهَةِ وَالسَّلَامَ وَأَذْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ بَأْذَنِ الْجَلَلِ
وَالْإِكْرَامِ.

[আল্লাহভ্য বাল্লিগ কুহা মুহাম্মদীন মিন্নাত তাহায়্যাতা ওয়াস্স সালামা ওয়া
আদবিলনা দারাস সালামি ইয়া যালযালালি ওয়াল ইকরামি]

-হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সালাহুল্লাহ
আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহের প্রতি দরুদ ও সালাম পৌছান। হে মহসু
ও সম্মানের অধিকারী আমাদেরকে নিরাপত্তার ঘরে প্রবেশ করান।

মিনার দিকে রওয়ানা

সূর্যোদয় হতে দু'রাকাত নামায পড়ার মতো সময় বাকী থাকতে মুয়দালিফা হতে
মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া উচিত। মিনায় নিষ্কেপের জন্যে পাথরকুচি মুয়দালিফা
হতে সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। চেষ্টা করবেন যেন তিনদিন ব্যবহারের জন্য
অন্তত সত্ত্বুরটি কংকর পাক-পবিত্র স্থান থেকে তুলে তিনবার ধুয়ে নিজের কাছে
সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন, যাতে সেখানে গিয়ে অসুবিধায় পড়তে না হয়।

মুয়দালিফা হতে রওয়ানা দেওয়ার সময় ওয়াদিয়ে মুহাস্সার-এর পথে যাবেন না।
এটি মুয়দালিফা হতে খারিজ। অপারগবশতঃ যদি কেউ এই উপত্যকা দিয়ে যায়
তা হলে খুব দ্রুত পথ পাড়ি দেয়া উচিত, কেননা, এই উপত্যকায় আসহাবে
ফীলের উপর আযাব পতিত হয়েছিল।

জামরায়ে আক্তাবা (জ্যেষ্ঠ শয়তান) এর উপর প্রথম প্রস্তর নিষ্কেপ
মিনায় পৌছে প্রথমে জামরায়ে আক্তাবার দিকে রওয়ানা দিবেন। জামরায়ে
আক্তাবা হল শেষ স্থুটি। তার ওপর সাতটি পাথর নিষ্কেপ করা হয়। আর এই
দিনে শুধুমাত্র এটিতেই নিষ্কেপ করা হবে। এই নিষ্কেপন কর্ম সূর্যোদয় হতে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোনো সময় করা যাবে। প্রতি প্রস্তর নিষ্কেপকালে মুখে এই শব্দ উচ্চারণ করবেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ.

[বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর রাগমাল লিখ শয়তান]

-আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, শয়তান যেন হয় অপমানিত।

কোরবানী

রামীর কাজ সেরে কুরবানীতে মশগুল হয়ে যাবেন। এটি হ্যরত ইবরাহীম ও হ্যরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের স্মৃতিচারণে হজ্রের শুকরিয়াশ্বরূপ করা হয়। কোরবানী ভেড়া, ছাগল, দুঃস্ব, গাড়ী, বা উট যে কোনো একটি দেওয়া যাবে। পার্থক্য এইটুকু যে, ছাগল ও ভেড়াতে অংশীদারিত্ব চলবেনা, পক্ষান্তরে গরু ও উটে অনধিক সাতজন শরীক হতে পারবে। এখানে কোরবানীর পশুর বয়স ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে সেই সব শর্ত আছে যা দুর্দল আযহার কোরবানীতে পালনীয়। যদি কোরবানীর সামর্থ না থাকে তা হলে দশটি রোয়া রাখতে হবে; তিনটি হজ্রের দিনগুলিতে আর সাতটি হজু থেকে ফিরে গিয়ে।

হলক বা কসর

কোরবানী করার পর কিবলামুখী হয়ে পুরুষরা হলক (মাথা মুণ্ডানো) বা কসর (ছেট করে কেটে ফেলা) করবে। কিন্তু তমধ্যে কসরের চেয়ে হলক উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ﴿أَفْغِرْ مِنْ لِلْمُحْلَقِينَ﴾ “হে আল্লাহ, মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করে দিন।” মাথা হলক করার সুন্নাত নিয়ম হল, ডান দিক থেকে প্রথমে মুণ্ডন করবে। আর যদি ছেট করে তা হলে হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরিমাণ কর্তন করবে।

মহিলারা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবেন। নারী-পুরুষ উভয়ে তাদের কর্তিত লোম দাফন করে ফেলবেন। হলক বা কসরের আগে নখ বা গোঁফ কিছুই কাটা যাবেনা।

ইহরাম খুলে ফেলা

হলক বা কসরের পূর্বে ইহরাম খোলা যাবেনা। অতএব যখন মাথা মুণ্ডন বা চুল কর্তন থেকে ফারেগ হবেন তখন ইহরাম খুলে ফেলবেন এবং সাধারণ লেবাস

পরবেন। এখন স্তৰীর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কাজ ব্যতীত ইহরাম যা যা হারাম করেছিল সব হালাল হয়ে গেছে।

তাওয়াফে যিয়ারাত

কোরবানী, হলক, কসর এবং ইহরাম খোলার পর তাওয়াফে যিয়ারাতের জন্য মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা দিবেন। এই তাওয়াফে ইয়তুবা নেই। কেননা, এটি সাধারণ লেবাসে করা যায়। তাওয়াফে যিয়ারাত হজ্রের দ্বিতীয় শুরুত্বপূর্ণ রূক্ন আর এটি ওমরার তাওয়াফের ন্যায়ই আদায় করা হবে। তাওয়াফে যিয়ারাত পালন করার সময় দুর্দল আযহার ফজর থেকে নিয়ে আইয়ামে নাহরের শেষ পর্যন্ত। যদি ১২ যিলহজু সূর্যাস্তের আগে আগে করে নেওয়া যায় তা হলেও জায়েয। যদি তারিখ চলে যায় আর তাওয়াফে যিয়ারাত করা সম্ভব না হয় তা হলে দম দিতে হবে এবং তাওয়াফও আদায় করতে হবে।

অতএব যখন তাওয়াফে যিয়ারাত করে নিবে তো এখন ইহরাম সংক্রান্ত সকল নিষেধাজ্ঞা এমনকি স্তৰী সংক্রান্ত সকল নিষেধাজ্ঞাও বন্ধ হয়ে গেছে।

হজ্রের সাঁদি

তাওয়াফে যিয়ারাতের পর আপনি সাধারণ পোশাকে সাফা-মারওয়ার সাঁদি করবেন। হজ্রের সাঁদির পর আপনি দু'রাকাত নফল নামায পড়বেন। এসব কর্মক্রিয়া আঞ্জাম দেওয়ার পর আপনি আলহামদুল্লাহ তাওয়াফে বিদা’ আর রামীর দিনসমূহ (হজ্রের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠি দিবস- ১১, ১২, ১৩ যিলহজু) তাওয়াফে যিয়ারাত হতে ফারিগ হয়ে আপনি মিনায় ফিরে আসুন এবং দু'দিন দু'রাত এখানে অবস্থান করুন।

এগারো তারিখ যুহরের নামাযের পর আবার রামী করার জন্যে রওয়ানা হবেন আর জমরা উলা হতেই রামী শুরু করবেন। অতঃপর জামরা উসতার দিকে যাবেন আর রামীর পর কিছু সামনে অগ্রসর হয়ে মুখ আর মন যোগ করে উপস্থিত অন্তর (কৃলবে হায়ির) থেকে দোয়া ও ইস্তিগফার করবেন। অতঃপর জামরায়ে আকৃবায় যাবেন, তবে এখানে রামী করার পর থামবেন না বরং অবিলম্বেই ফিরে আসবেন।

আর ফিরে আসার সময় দোয়া করবেন।

এভাবে বারো তারিখ দ্বিতীয়ের পর রমী করবেন এবং ওই দিন রমী করে সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হবেন।

তাওয়াফে বিদা

যখন ফেরার ইচ্ছা করবেন তখন তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) আদায় করবেন। কিন্তু সেখানে রমল সাঙ্গ ইয়ত্বে ইত্যাদি করবেন না। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত পড়ে যময়ে আসবেন। নিজ হাতে পানি নিবেন আর কিবলামুখী হয়ে খুব ত্প্রিয়ে পান করবেন। প্রতি নিঃশ্বাসে চোখ তুলে আল্লাহর প্রিয় ঘরের দিকে তাকাবেন। নিজের দেহে, মাথায় ও মুখেও পানি লাগাবেন। পানি পান করার সময় এই দোয়া পাঠ করবেন-

اللَّهُمَّ أَسْتَلْكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَآسِعًا وَشَفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

[আল্লাহমা আস আলুকা ইলমান নাফিলাও ওয়া রিয়কান ওয়াসিয়াও ওয়া শিফায়াম মিন কুণ্ডি দা-য়িন]

-হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রমস্ত্র রিয়িক ও প্রত্যেক রোগ থেকে আরোগ্য চাচ্ছ।

যময়ম থেকে ফারিগ হওয়ার পর মূলতায়িমে আসবেন। সেখানে কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে চুম্বন করবেন। কা'বার গিলাফ ধরে বিনয়-ন্মৃতার মৃত্তি হয়ে এই দোয়া করবেন-

السَّائِلُ بِبَابِكَ يَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَيَرْجُو رَحْمَتَكَ.

[আস সা-য়িলু বি-বাবিকা, ইয়াসু আলুকা মিন ফাদলিকা ওয়া মা'রফিকা ওয়া ইয়ারজু রাহমাতাকা]

-তোমার দরজার ভিথারী তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ও দয়াসমূহের জন্য প্রার্থনা করছে এবং তোমার রহমতের আশা পোষণ করছে।

কা'বা শরীফ থেকে বিদায়াস্তের দোয়া

আপনি যখন তাওয়াফে বিদা, যময়ম ও মূলতায়িম থেকে ফারিগ হয়ে যাবেন তখন হাজরে আসওয়াদকে মুহার্কত ও দরদ নিয়ে চুম্ব খাবেন এবং কা'বা মুআয়ামার বিদায়-বিরহে আফসোস করে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে উল্টো দিকে হেঁটে মসজিদে হারামের বাইরে চলে আসবেন আর আসার সময় এই দোয়া পড়বেন-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا أَخِيرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْنَكَ الْحَرَامِ وَإِنْ جَعَلْنَا فَعَوْضًا مِنْهُ اجْنَةً
آتِيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ لِلرَّحْمَةِ قَاصِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ نَصَرَ
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَخَدَهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

[আল্লাহমা সা তাজআলহ আ-ধিরাল আহদি মিন বাযতিকাল হারামি, ওয়া ইন জা'আলতা ফাআওভিজ মিনহল জান্নাতা আ-য়িবুনা তা-য়িবুনা আ'-বিদুনা লিরাবিনা হা-যিদুনা, লির রাহমাতি কুসিদুনা, সাদাকাল্লাহ ওয়া'দাহ, নাসারা আবদাহ ওয়াহায়ামাল আহয়াবা ওয়াহদাহ, সা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়িল আযীম]

-হে আল্লাহ! করো না আমার এ হজুকে শেষ সাক্ষাত তোমার সম্মানিত ঘরের সাথে এবং যদি তুমি এটাকে শেষ সাক্ষাতই করে থাক তবে সেটার বিনিময়ে জান্নাত দান কর। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন প্রতিপালকেরই প্রশংসাকারী, তাঁরই রহমতের প্রতি মনোনিবেশকারী। সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন আপন ওয়াদাকে। সাহায্য করেছেন আপন খাস বান্দা (হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এবং পরাম্পর করেছেন কাফিরদের বাহিনীসমূহকে একাকীই। নেই শক্তি সৎকাজ করার, না পাপ থেকে বাঁচার, বহু উচ্চ ও মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত।

পরিবারকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দেওয়া

হজু থেকে ফেরার ব্যাপারে ওই নিয়ম খেয়াল রাখবেন যা এ যাবত বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া ফেরার সময় বাড়িতে আপনার প্রত্যাবর্তনের খবর জানিয়ে দিবেন। যদি সন্তুষ্ট হয় তা হলে দিনের বেলায় বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। শরীয়তের শিক্ষা এটাই। ঘরে এসে দু'রাকাত নফল নামায পড়বেন। অতঃপর আজীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরসহ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। পারলে তাদের জন্যে কিছু হাদিয়াও সঙ্গে আনবেন।

অষ্টম অধ্যায়

হজু ও ওমরার মাসায়িল

হজুর বিবরণ

হজু ফরয হয়েছে হিজরী নবম বর্ষে। নামায, রোয়া ও যাকাতের ন্যায হজুও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূক্ন বা ভিত্তি। তা ফরয হওয়াটা সম্পূর্ণ দৃঢ় ইয়াকীনী বা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত। যে ব্যক্তি তা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে কাফির আর যার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আদায় করতে বিলম্ব করবে সে গোনাহগার হবে। হজু যে ব্যক্তি তরক বা উপেক্ষা করবে সে ফাসিক হবে এবং জাহানামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। পুরো জীবনে একবারই হজু করলে যথেষ্ট। এ কারণে ওলামায়ে কিরাম গুরুত্বারোপ করেছেন যে, হজুপালনকারীর জন্যে যথাসম্ভব মুস্তাহাব ও সুন্নাত ইত্যাদিও ফরয এবং ওয়াজিবের মতো ইহতিমাম করে আদায় করা উচিত। সাথে সাথে বিভিন্নস্থানে বিশেষ দোয়ায়ে মাসন্না ও মাচুরা (যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত) এবং যিকির-আযকার ও খুশু-খুযুর ইহতিমাম ও সবিশেষ খেয়াল রাখার প্রয়োজন। সে হিসেবে এখানে হজুর মাসায়িলসমূহ সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করা যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে ইরশাদ করেন-

وَأَتِمُوا أَنْجَعَ وَالْعُرْبَةَ لِلّهِ

-আল্লাহর ওয়াস্তে হজু ও উমরা পরিপূর্ণ কর।^১

হাদীস শরীফে হজু ও ওমরার ফযীলত, তাৎপর্য ও সওয়াবের ব্যাপারে অসংখ্য খোশখবর এসেছে। তবে হজু পুরো জীবনে একবারই ফরয।

হাদীস

এক হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি হজু আদায় করলো আর হজু আদায়কালে সর্ব প্রকার অভদ্র ও কুরগচিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হতে মুক্ত থাকলে তো সে গুনাহবিহীন এমন পুতৎপবিত্র হয়ে ফিরলো যে, যেন সে ওই দিনই তার মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হল।

^১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৯৬

হাদীস

হজু ও ওমরা গুনাহকে এভাবে বিদূরিত করে দেয় যে, যেমন কর্মকারের চুল্লী লোহা ও রূপার ময়লা-আবর্জনা ধ্বংস করে দেয়। আর মাবরুর (মাকবূল) হজুর সওয়াব জান্নাতই।

হজুর প্রকারভেদ

আদায় করার পদ্ধতি হিসেবে হজু তিন প্রকার

১. ইফরাদ

ওই পদ্ধতিকে হজু ইফরাদ বলা হয় যাতে শুধুমাত্র হজুর ইহরাম পরা হয়। হজু পালনেচ্ছু ব্যক্তি তাতে ওমরা আদায় করেন না বরং তিনি শুধুমাত্র হজুই আদায় করতে পারেন। ইহরাম বাঁধার পর থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হজু পালনার্থীকে ধারাবাহিকভাবে ইহরামের শর্তাবলি মেনে নিতে হয়।

২. ক্রিরান

হজু ও ওমরার একসাথে ইহরাম বেঁধে উভয়ের আরাকানসমূহ আদায় করার নামই হচ্ছে ক্রিরান। হজুর ইচ্ছুক ব্যক্তি পবিত্র মুকায় পৌছে প্রথমে ওমরা করেন তারপর ওই ইহরামেই তাকে হজু আদায় করতে হয়। এ সময় ইহরাম ময়লা বা নাপাকবুক্ত হলে পাল্টাতে পারেন তবে অন্যান্য সকল আইনকানুন বহাল থাকবে।

৩. তামাতু

হজুর ওই পদ্ধতি যেখানে হজু ও ওমরা একসঙ্গে আদায় করা যায়। এই অবস্থায় মুকাররামায় ওমরা আদায় করার পর হাজী ইহরামের বাইরে আসতে পারবে। অষ্টম যিলহজু অর্থাৎ হজুর নিয়তে ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত ইহরামের যাবতীয় বিধিনিষেধ বিমোচিত হয়ে যায়।

উপরোক্ত তিন পদ্ধতির মধ্যে তামাতু অপেক্ষাকৃত সহজ হজু। উপরন্তু তাৎপর্য ও ফযীলতের দিক দিয়ে ক্রিরান হজুই সর্বোত্তম।

হজু ফরয হওয়ার শর্তাবলি

হজু ওয়াজিব (ফরয) হওয়ার ব্যাপারে আটটি শর্ত। ওই সব শর্ত অনুপস্থিত থাকলে হজু করা জরুরী হয় না।

১. মুসলমান হওয়া। (কাফের-বিধীনীর উপর হজু ফরয নয়)

২. দারুল হারবে হলে হজু ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিষয় বলে অবগত হতে হবে।

৩. বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হতে হবে। নাবালেগ হলে ফরয হয় না।

৪. জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং পাগল-নির্বাধের উপর হজু ফরয হয় না।

৫. আয়াদ (স্বাধিকারপ্রাণ) হতে হবে। কৃতদাস-দাসীর উপর হজু ফরয নয়।

৬. সুস্থ হতে হবে। অর্থাৎ হজু যাওয়ার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ এবং দৃষ্টিমান হওয়া পূর্বশর্ত। তাই পঙ্গু, প্যারালাইসিস রোগী, পা কাটা ব্যক্তি এবং ওই বৃদ্ধার ওপর যে যানবাহনে সওয়ার হতে পারেনা- হজু ফরয হবেনা। তদ্রপ অন্ধ ব্যক্তির উপরও হজু ফরয নয়, যদিও সে কোনো লোকের হাত ধরে যেতে পারে। এসব লোকদের ওপর তাও জরুরী নয় যে, কোনো ব্যক্তি পাঠিয়ে নিজের পক্ষ থেকে হজু আদায় করাবে।

৭. সফরের ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্যবান হতে হবে। অর্থাৎ সাওয়ারীর মালিক হতে হবে বা তার কাছে এতটুকু সম্পদ থাকতে হবে যা দ্বারা সে বাহন ভাড়ায় নিতে পারে।

৮. হজুর সময় অর্থাৎ হজুর মাসে এই সব শর্ত পাওয়া গেলে।^১

হজু আদায় করার শর্তাবলি

এ পর্যন্ত হজু ফরয হওয়ার ব্যাপারে শর্তাবলির বর্ণনা চলেছে। এখন আদায় করার শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা হবে। এসব শর্ত যদি পাওয়া যায় তা হলে হজু যাওয়া জরুরী। আর যদি এসব শর্ত অনুপস্থিত হয় তা হলে হজু যাওয়া জরুরী নয়। অন্য কারো দ্বারা করালেও আদায় হয়ে যাবে অথবা অসিয়ত করে যাবে কিন্তু এতে এ-ও জরুরী যে, হজু করানোর পর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজে যাওয়ার সামর্থ হারা হতে হবে। অন্যথায় নিজেকেও আবার হজু আদায় করতে হবে।

নিম্নে শর্তাবলি বর্ণিত হল-

১. যাত্রাপথে নিরাপত্তা থাকলে। অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়ে অধিক ধারণা থাকলে হজু যাওয়া জরুরী। আর যদি প্রবল আশংকা থাকে যে, চোর-ডাকাত বা বিপদাপদে প্রাণের ভয় হতে পারে তো তখন হজু যাওয়া প্রয়োজন হয় না।

২. মহিলার যাত্রাপথের দুরত্ব যদি তিন দিনের বা তারচে বেশি হয় তা হলে তার সঙ্গে স্বামী বা কোনো মাহরাম থাকা শর্ত। মহিলা যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা হুকুম অভিন্ন। পথ যদি তিন দিনের চেয়ে কম দুরত্বের হয় তখন স্ত্রীলোক তার স্বামী বা মাহরাম ব্যতিত সফর করতে পারবে। মাহরাম থেকে উদ্দিষ্ট ওই ব্যক্তি যার সঙ্গে চিরতরের জন্যে ওই মহিলার বিবাহ

হারাম। চাই তা নসবের কারণে হোক যেমন পিতা, পুত্র, ভাই ইত্যাদি। অথবা দুধসম্পর্কিত আত্মীয়তার কারণে হারাম হোক, যেমন- দুধভাই, দুধপিতা, দুধভাতা ইত্যাদি কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হোক যেমন শ্শশ্র বা স্বামীর পুত্র। স্ত্রীলোক যে মাহরামের সঙ্গে সফর করবে সে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাণবয়স্ক ও সৎ (পরহেয়গার) হওয়া শর্ত।

৩. হজু যাওয়ার মুহূর্তে মহিলার ইন্দতে না হওয়া জরুরী। মৃত্যুভিত্তিক ইন্দত হোক কিংবা তালাক সংক্রান্ত।

৪. বন্দী না হওয়া শর্ত; বরং মুক্ত হতে হবে।^১

আদায় সহীহ হওয়ার জন্যে শর্তাবলি

হজুর আদায় সহীহ হওয়ার জন্য নয়টি শর্ত আছে, তা পাওয়া না গেলে হজু সহীহ হবে না।

১. মুসলমান হওয়া।

২. ইহরাম। বিনা ইহরামে হজু সহীহ হবে না।

৩. হজুর সময় হওয়া। অর্থাৎ হজুর জন্যে যে সময় শরীয়াতের পক্ষ হতে নির্ধারিত আছে তার পূর্বে হজুর কার্যকলাপ আদায় করলে সহীহ হবে না।

৪. হজুর কাজকর্ম আদায়ের নির্দিষ্ট জায়গায় তা আদায় করা। যথা তাওয়াফের স্থান মসজিদে হারাম। ওকুফ (অবস্থান)'র স্থান আরাফাত ও মুয়দালিফা। কংকর নিক্ষেপের স্থান মিনা। এসব কাজকর্ম যদি অন্য কোথাও করা হয় তা হলে হজু আদায় হবে না।

৫. বিবেক-বোধসম্পন্ন হতে হবে। এতো ছোট বাচ্চা যে, সে কোনো বিষয় বা বন্ধুর ব্যাপারে সঠিক বিবেচনা করতে পারে না তার হজু সহীহ হবে না।

৬. আকল বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। পাগল উন্নাদের হজু সহীহ নয়।

৭. হজুর ফরযসমূহ আদায় করা। যে ব্যক্তি হজুর কোনো ফরয ছেড়ে দিবে তার হজু সহীহ হবে না।

৮. ইহরামের পর আর আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে সহবাস করা যাবে না। যদি করে হজু বাতিল হয়ে যাবে।

৯. যে বছরে ইহরাম পরেছে সে বছরেই হজু পালন জরুরী হয়ে যায়। যদি একবছর ইহরাম বেঁধে ওই ইহরাম দ্বারা পরের বছর হজু আদায় করতে চায় তা হলে ওই হজু সহীহ হবেনা।^১

হজুর ফরয়সমূহ

হজু এই কাজগুলো করা ফরয।

১. ইহরাম; যা শর্ত।

২. আরাফা প্রান্তের অবস্থান। অর্থাৎ নবম যিলহজু অপরাহ্নের পর থেকে দশম যিলহজু সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত সময়ের কোনো অংশে আরাফাতে অবস্থান করা।

৩. তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ, অর্থাৎ চার প্রদক্ষিণ। উপরোক্ত দু'টি (আরাফার ওকূফ ও তাওয়াফে যিয়ারত) হজুর রূক্ন বা মূল।

৪. নিয়ত।

৫. তারতীব। অর্থাৎ প্রথমে ইহরাম পরা, তারপর আরাফায় অবস্থান করা, অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারত করা। প্রতিটি ফরয নিজস্ব সময়ে আদায় করা।

৬. স্থান। অর্থাৎ আরাফাতের অবস্থান আরাফা প্রান্তের ভূমিতে হওয়া। বাতনে আরফা ব্যতিত (আরাফাত প্রান্তের একটি নালার নাম)। আর তাওয়াফের স্থান মসজিদুল হারাম।^১

হজুর ওয়াজিবসমূহ

হজুর ওয়াজিবসমূহ এই-

১. মীকাত (ইহরাম পরার স্থান) থেকে ইহরাম বাঁধা। অর্থাৎ মীকাত থেকে ইহরাম ব্যতিরেকে সামনে অগ্রসর না হওয়া। আর যদি মীকাতের আগে থেকে ইহরাম পরা যায় তবুও জায়েয়।

২. সাফা মারওয়ার (দু'টি পর্বতের নাম) মাঝে দৌড়ানো। তাকে সাঁজি বলা হয়। আর সাঁজি সাফা থেকে শুরু করা।

৩. যদি কোনো ওয়র বা সমস্যা না থাকে তা হলে পায়ে হেঁটে সাঁজি করা।

৪. দিনের বেলায় যদি আরাফাতের প্রান্তের অবস্থান করে তা হলে এতক্ষণ ধরে অবস্থান করা যাতে সূর্য অন্তমিত হয়ে যায়। সূর্য অন্তগমনেন্মুখ হতেই শুরু করা হোক বা পরে। মোটকথা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওকূফে ব্যস্ত থাকবে। আর যদি রাতের বেলায় আরাফাতে অবস্থান করে তখন কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কিন্তু দিনের বেলায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওকূফ যা ওয়াজিব ছিলো তা তরক হয়ে গেলো।

^১. বাহারে শরীয়ত

^২. দুরুরে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার

৫. আরাফাত থেকে ফেরার সময় ইমাম যদি বিলম্ব করে তা হলে ইমামের আগে আরাফাত ময়দান থেকে বের হবেন। হ্যাঁ যদি ইমাম ওয়াক্তের চেয়েও বিলম্ব করে তখন ইমামের আগে ময়দানে আরাফাত থেকে রওয়ানা দেওয়া জায়েয়। আর যদি জবরদস্ত ভিড়ের কারণে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে ইমাম চলে যাওয়ার পরও আরাফাতে থেকে যায় তবুও কোনো অসুবিধা হবেন।

৬. মুয়দালিফা (আরাফাত ও মিনাৰ মধ্যবর্তী স্থান)-এ অবস্থান করা।

৭. মাগরিব ও ইশার নামায ইশার সময়ে মুয়দালিফায় গিয়ে আদায় করা।

৮. জামরাতুল আক্টাবায (বড় শয়তান) রমীর প্রথম দিন মাথা মুণ্ডনো বা চুল কর্তন করা।

৯. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কর্তন করা। আর তা মিনা বা হারামের সীমানার ভেতরে হতে হবে।

১০. কিরান বা তামাত্রকারীদের কোরবানী দেওয়া।

১১. উক্ত কোরবানী হারামের সীমানায় ও আইয়ামে নাহরে হওয়া।

১২. তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ আইয়ামে নাহরে হওয়া। আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে তাওয়াফ করা হয় তাকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। তাকে ‘তাওয়াফে ইফায়া’ও বলা হয়।

১৩. তাওয়াফ হাতীম (উক্ত দেওয়াল সংলগ্ন বাইরের দিকে কা’বার অংশ) এর বাইরে হওয়া।

১৪. ডান দিক থেকে তাওয়াফ করা। অর্থাৎ কা’বা শরীফ তাওয়াফকারীর বাম পার্শ্বে হবে।

১৫. কোনো ওয়র-আপন্তি না থাকলে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ করা। না হয় যানবাহনেও তাওয়াফ করা যায়।

১৬. তাওয়াফ করার সময় অজুসহ ও গোসলসহ থাকা। যদি অজুবিহিন বা জানাবাতের অবস্থায় (গোসল ফরয হয় এমন অবস্থায়) তাওয়াফ করে তা হলে ওই তাওয়াফ পুণরায় করতে হবে।

১৭. তাওয়াফের সময় সতর (দেহের যে অংশ ঢাকা জরুরী) ঢেকে রাখা।

১৮. তাওয়াফের পর মকামে ইবরাহীমে দু’রাকাত নফল নামায ‘তাহিয়াতুত তাওয়াফ’ পড়া।

১৯. কংকর নিষ্কেপ, কোরবানী ও তাওয়াফে যিয়ারতে তারতীব ঠিক রাখা (অর্থাৎ প্রথমে কংকর নিষ্কেপ করবে তারপর অমুফরিদ [যে লোক ইফরাদ

করেনি। কোরবানী করবে তারপর মাথা মুণ্ডন করবে। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারাত করবে।)

২০. তাওয়াফে সদর অর্থাৎ মীকাতের বাইরে বসবাসকারীদের জন্যে মক্কা থেকে চলে যাওয়ার সময় কাবার তাওয়াফ করা।

২১. আরাফার অবস্থানের পর থেকে নিয়ে মাথা মুণ্ডনো পর্যন্ত স্তু-সহবাস না করা।

২২. ইহরামের নিষিদ্ধ বস্তু যেমন সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা এবং মুখ ও মন্তক আবৃত করা থেকে বিরত থাকা।^১

তাওয়াফের ক্রিয়া জরুরি মাসায়িল

- তাওয়াফের সময় পানাহার করা মাকরুহ।
- যে তাওয়াফের পর সাঁই (সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়া) করতে হয় তাতে রামল ও ইযত্তেবা' জরুরী। রামল অর্থ প্রথম তিন চক্রে পাহলওয়ানের মতো খুব দন্তসহকারে দ্রুত যাওয়া যাতে তাওয়াফকারীকে সবল ও শক্তিশালী বলে মনে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে রামল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ইযত্তেবা' অর্থ চাদরের ডান অংশ বগলের তলদেশ থেকে বের করে বাম কাঁধে রাখা। মহিলারা রামল ও ইযত্তেবা করবেন।
- তাওয়াফের মুহূর্তে নামাযের জামাত শুরু হলে তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে ফরয নামাযে শামিল হয়ে যাবেন। নামাযের পর বাকী তাওয়াফ আদায় করবেন।
- বায়তুল্লাহর যত স্তুব নিকটে তাওয়াফ করা উত্তম।
- যে সব সময়ে নামায মাকরুহ সেসব সময়ে তাওয়াফ মাকরুহ নয়।
- যদি কেউ সাত চক্র শেষ করে আরো একটি চক্র দিয়ে ফেলে তা হলে আরো ছয়টি চক্র লাগানো তার জন্যে জরুরী। কেননা, নফল ইবাদত শুরু করলে তা পরিপূর্ণ করে নেওয়া ওয়াজিব।
- তাওয়াফের পর সাঁই করা সুন্নাত। সাঁইতে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত বার প্রদক্ষিণ ওয়াজিব।

^১. বাহারে শরীয়ত, ২/২১০

হজুর সুন্নাতসমূহ

হজুর সুন্নাতসমূহ এই-

১. তাওয়াফে কুদূম। অর্থাৎ মীকাতের বাইরে থেকে আসা লোকেরা মক্কায় পৌঁছার পর সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ আদায় করে তাকে তাওয়াফে কুদূম বলা হয়। তাওয়াফে কুদূম মুফরিদ ও কারিনের জন্যে সুন্নাত, মুতামাতি' (তামাতু পালনকারীর জন্য) নয়।
২. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
৩. তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে যিয়ারাতে রামল করা। অর্থাৎ ক্ষক্ষ মোচড়িয়ে মোচড়িয়ে আর ছেট ছেট কদমে দন্ত নিয়ে চলা।
৪. সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থিত দুটি সবুজ বর্ণের পোস্ট 'মীলাইনে আখ্যারাইন'র মাঝে দৌড়া।
৫. সপ্তম ফিলহজু ইমাম সাহেবের খুতবা পাঠ করা।
৬. তদ্রপ আরাফাতের ময়দানে নবম ফিলহজু খুতবা পাঠ করা। মিনাতে এগারো তারিখ খুতবা পড়া।
৭. অষ্টম ফিলহজু মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া যাতে মিনায় যুহর আসর মাগরিব ইশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যায়।
৮. ফিলহজুর নবম তারিখ রাত মিনায় অতিবাহিত করা।
৯. সূর্য উদয়ের পর মিনা প্রাত্ম ত্যাগ করে আরাফাতে গমন করা।
১০. আরাফাত ময়দানে যুহর এবং আসর একসঙ্গে আদায় করা। আর সূর্যাস্তের পর মুয়দালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা দেওয়া।
১১. দশ ও এগারো তারিখের পর উভয় রাত্রি মিনায় কাটানো।
১২. আবতাহ অর্থাৎ ওয়াদিয়ে মুহাস্সাবে অবতরণ করা, যদিও অল্প কিছুক্ষণের জন্যে।^১

জরুরী জ্ঞাতব্য

হজুর ফরযসমূহ হতে যদি একটি ফরযও বাদ যায় তা হলে হজু আদায় হবে না। আর ওয়াজিবসমূহ হতে যদি একটি ওয়াজিবও বাদ যায় ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছায় তখন একটি কোরবানী দেওয়া জরুরী। তবে হজু বাতিল হবে না। তবে কোনো ওয়াজিব এমনও আছে যা বাদ গেলে কোরবানী ওয়াজিব হয় না। যেমন তাওয়াফের পর দু'রাকাত নফল নামায 'তাহিয়াতুত তাওয়াফ' ওয়াজিব, তা যদি কারো ছোটে যায় তা হলে কোরবানী দিতে হবে না। হজুর সুন্নাতসমূহ থেকে

^১. বাহারে শরীয়ত

যদি কোনো একটি বাদ যায় তা হলে হজু বাতিলও হবেনা এবং কোরবানীও দিতে হবে না। তবে হজুর সাওয়াবহাস পাবে।

হজু ও ওমরার বিবিধ মাসায়িল

ইহরামে জোড়া-তালি লাগানো

ইহরামের অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকা চাই। কিন্তু যদি আপনার ইহরামের কাপড়ে এমন কোনো স্থানে ফেটে গেছে যা সেলাই করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, তখন অন্য কথা। সুতরাং আপনি প্রয়োজন মুহূর্তে ইহরাম সেলাই করতে পারেন।

মহিলাদের হজু

হজু ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের হকুম অভিন্ন। যাতায়াতের খরচ ও শক্তি-সামর্থ্য যার থাকবে তার হজু করা ফরয। সে চাই পুরুষ কিংবা নারী। যে তা আদায় করবে না সে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে। মহিলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হকুম হল সে তার স্বামী বা কোনো মাহরাম ব্যক্তি ব্যতিত সফর করতে পারবে না। এরূপ সফর তার জন্য হারাম। কিন্তু যদি সে মাহরাম ছাড়া হজু করে ফেলে তা হলে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে কিন্তু হজু মাকরহ হবে এবং প্রতিটি কদমে কদমে গোনাহ হওয়ার কারণে তার পরিণাম হবে ভিন্ন। যুবতী হোক কিংবা বৃদ্ধা, সব মহিলার হকুম এক ও অভিন্ন।^১

পিতামাতা ঝণ্ঠস্ত হওয়ায় সন্তানের হজু বাদ যাবে না

যদি কোনো ব্যক্তি নিজস্ব টাকায় হজুর সামর্থ রাখে তখন তার ওপর হজু ফরয হয়। ফরয হজুর পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনকি পিতামাতার বারণ করারও অধিকার নেই; বরং হজু আদায় করতে যাওয়া লোকটির কর্তব্য, যদিও তার পিতামাতা তাকে বারণ করে। আর পিতামাতা কর্জগ্রস্ত হওয়ায় হজু ফরয হওয়াতে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। সামর্থবান হলেই হজু করা ফরয।^২

শীতকালে ইহরামের উপর উষ্ণবন্ধ পরিধান করা

শীত মৌসুমে ইহরামের কাপড়ের উপর কম্বল বা পশ্চমী চাদর ইত্যাদি সেলাইবিহীন শীতনিবারক কাপড় একাধিক হলেও গায়ে দেয়া জায়েয়। ঘুমের

সময় গরম লেপ বা জুবু ইত্যাদি মুখ ছাড়া দেহের অন্যসব স্থানে জড়ানো জায়েয় এবং নিচে বিছাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

হজুর আসগার ও হজুর আকবার

হজুর আসগার ও মরাহকে বলা হয়। কারণ তাতেও হজুর ন্যায় তাওয়াফ ও সাঈ আদায় করা হয়। পক্ষান্তরে হজু তার চেয়ে ‘আকবার’ (বড়)। কেননা, তাতে এসব কাজকর্ম ব্যতিরেকে আরাফাত ও মুয়দালিফায় অবস্থান ও মিনার কার্যকলাপ রয়েছে।

জুমার দিনে আরাফাতে ওকুফ করা

আরাফাতের অবস্থান যে দিনেই হোক তা হজুর আকবরই। তা ওমরা নয় যাকে হজুর আসগার (ছোট হজু) বলা হয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে যদি ওই দিন জুমাবার হয় তা হলে হজুর বরকত বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজু জুমার দিনেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তো সে হিসেবে এই সাদৃশ্য ও মিলের কারণে আরো বরকতময় হয়ে যাওয়ার আশা। তদুপরি জুমার দিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন, আর আরাফার দিবস তো আরেকটি ঈদ; তো একদিনে দু'টি ঈদের সুযোগ হয়ে যাওয়া ‘নূরুন ‘আলা নূর’ ও ‘করম বালায়ে করম’। বাংলায় বলা হলে সোনায় সোহাগা।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহামাকে এক ইয়াহুদী বললো, যদি **أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** আয়াতটি আমাদের উপর নাফিল হতো তা হলে ওই দিনটিকে আমরা ঈদের দিন মেনে নিতাম। তখন তিনি বললেন, এই আয়াতটি দু'ঈদের দিনে অবর্তীণ হয়েছে; জুমা ও আরাফার দিনে। অর্থাৎ ওই দিনকে নতুন করে ঈদ বানানোর প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ তাআলা যে দিনে আয়াতটি নাফিল করেছেন ওই দিন দু'ঈদ ছিল জুমা ও আরাফা। উভয় দিন মুসলমানদের জন্য ঈদ। ওই দিনে এই উভয় ঈদ একত্রিত ছিল, একটি জুমা অপরটি যিলহজুর নবম তারিখ।^৩

বদলী হজু ও তার শর্তাবলি

বদলী হজু অর্থাৎ আরেক জনের প্রতিনিধি হয়ে ফরয হজু আদায় করা যাতে তার পক্ষ থেকে ফরয আদায় হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত আছে। যে ব্যক্তি তার জীবদ্ধশায় দুর্বলতা বা অপারগতার কারণে নিজের পক্ষ থেকে বদলি হজু

^১. ফাতাওয়া-ই রেফতায়া

^২. ফাতাওয়া-ই রেফতায়া

^৩. জামে' তিরমিয়ী

করাবে তার জন্য শর্ত হল ওই অপারগতা ও অক্ষমতা শেষ জীবন পর্যন্ত থাকতে হবে। যদি বদলি হজু করানোর পর অক্ষমতা দূর হয়ে যায় আর স্বয়ং নিজেই হজু সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে তখন ইতিপূর্বে এক বা একাধিক যত বদলি হজু নিজের পক্ষ থেকে করানো হয়েছে তা আর ধর্তব্য হবে না। শুধুমাত্র নফলী হজুর সওয়াবই সে পাবে, ফরয আদায় হবেনা। এখন তার নিজেই হজু আদায় করা ফরয। অন্যান্য শর্তসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবে আছে।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজু

এ ধরনের যে বদলি হজু করা হয় তা দ্বারা দায়িত্বমুক্ত হয় না, ফরয আদায় থেকে যায়। হজু একটি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের সমষ্টি। যার উপর হজু ফরয হয়েছিল আর -নাউয়ুবিল্লাহ- হজু পালন করা ব্যতিত ইন্দোকাল করেছে তো স্পষ্টত সে দৈহিক অংশ থেকে তো অক্ষম হয়ে গেছে, কিন্তু এটি আল্লাহর একটি বিশেষ রহমত যে, শুধুমাত্র আর্থিক অংশ দ্বারা তার পক্ষ থেকে বদলি হজু কবৃল করে নেন যখন সে অসিয়ত করে যায়। আর এটিও আল্লাহর অশেষ কৃপা যে, ওয়ারিসের হজু করানোকেও কবৃল করে নেওয়া হয় যদিও মৃতলোক অসিয়ত করে না যায়। বদলি হজু পালনকারীকে ওই শহর থেকে যাত্রা করা উচিত যা মৃতের বসবাসের শহর। শুধুমাত্র মক্কা মুকাররমা থেকে হজু করালে তা আদায় হবেনা। বদলি হজু পালনকারী তাতে বিনিময় বা পারিশ্রমিকও চায়! পারিশ্রমিক নিলে তাতে সওয়াব কোথায়? যখন সে নিজে সওয়াব পায় না, তো মৃত ব্যক্তিকে কী পাঠাবে? বিশেষ করে পেশাদার যারা এই অন্যায় করে যে, দু'চারজন থেকে বদলি হজুর টাকা নেয়! আল্লাহ সকল মুসলমানকে হিদায়াত দান করুন। আমীন।^১

কোরবানীর মূল্য দান করা বা হারমের বাইরে কোরবানী দেওয়া জায়েয নেই
যার উপর কোরবানী ওয়াজিব, শুকরিয়াস্বরূপ হোক বা কোনো অপরাধের জরিমানাস্বরূপ হোক তার বিনিময় দান করা যাবেনা এবং হারমের বাইরে কোথাও কোরবানীও দিতে পারবেনা। কেননা এখনে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে কোরবানী ও জীবনোৎসর্গই উদ্দেশ্য। তার পরিবর্ততে দান করলে যথেষ্ট হবেনা। ঈদের কোরবানীতে যেমন ওয়াজিব হলে কোরবানী ছাড়া দায়িত্বমুক্ত হয় না তেমনিভাবে বাড়িতে ফিরে গিয়ে প্রাণী একটির পরিবর্তে হাজারটি কোরবানী দিলেও তার ওয়াজিব আদায় হবেনা। কেননা তার জন্যে তো হারমের ‘মাটি’ শর্ত ছিল।^২

হারাম মালে কৃত হজু কবৃল হয় না

কারো কাছে হালাল মাল এতোটুকু নেই যে, তাতে হজু করতে পারে। যদি ঘুষের লক্ষ লক্ষ টাকা তার কাছে জমা থাকে তখনও তার উপর হজু ফরয নয়। কারণ ঘুষের টাকা আত্মসাকৃত সম্পদ। সে ওই সম্পদের বৈধ মালিক নয়। আর যদি হালাল সম্পদ তার কাছে ওই পরিমাণ থাকে অথবা কোনো হজুর মওসুমে ওই পরিমাণ হালাল সম্পদ তার কাছে ছিলো তখন তার ওপর হজু ফরয হবে। কিন্তু ঘুষ ইত্যাদি হারাম টাকা তাতে ব্যয় করা সম্পূর্ণ হারাম। ওই হজু কবৃল হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা, যদিও ফরয দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হারাম সম্পদ নিয়ে যে ব্যক্তি হজু যায় আর লাক্বাইক বলে তখন ফিরেশতা উত্তরে বলে-

“তোমার হাজিরিও কবৃল নয় তোমার খেদমতও কবৃল নয়। তোমার হজু তোমার মুখে নিক্ষেপিত হবে যতক্ষণ না তুমি তোমার এই হারাম মাল-সম্পদ যা তোমার হাতে আছে ফেরত দিয়ে দাও।”

তাই সুন্দর পছ্টা হল, সে কর্জ নিয়ে ফরয আদায় করে নিবে। অতঃপর হালাল উপায়ে উপার্জন করে কর্জ পরিশোধ করবে। যদি আদায় হয়ে যায় তা হলে ভালো। অন্যথায় হাদীস শরীফে, আছে যে ব্যক্তি হজু, জিহাদ ও বিবাহের জন্য কর্জ গ্রহণ করে তো ওই কর্জ আল্লাহর অনুগ্রহের দায়িত্বে থাকে। আর যদি সে হাল্লু উপার্জনের দিকে জক্ষেপ না করে, ওই হারাম সম্পদ থেকে কর্জ পরিশোধ করে এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে থাকে তো এটি একটি গোনাহ। হজুর ফরয আদায় না করত তখন দু'টি গোনাহ হত। এভাবে একটি গোনাহ হতে মানুষ বেঁচে যেতে পারে।

তাওয়াফ ও অন্যান্য আমলের সাওয়াব প্রতিটি মওসুমে হয়

পবিত্র হারম শরীফে কৃত আমলের সাওয়াব সেই পুণ্যভূমির কারণে, হজুর সময়ের কারণে নয়। একটি নেকী করলে লাখের সাওয়াব হজুর সময়ে যেমন পাওয়া যাবে অদ্রপ অন্য সময়েও পাওয়া যাবে। কা'বার যে তাওয়াফ করা হয় তা যদি ফরয তাওয়াফ হয় তখন তো পরিষ্কার কথা যে, ফরযের সমতুল্য কোনো আমল হতে পারে না। আর যদি ওমরার তাওয়াফ হয় তা হলে তার সাওয়াবে আল্লাহর রহমতে কোনো তারতম্য হবে না। বিশেষ করে রম্যানে তার সাওয়াব যিলহজুর চেয়ে অধিক। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

“রম্যান মুবারকে একটি ওমরা করা আমার সঙ্গে একটি হজু করার সমতুল্য।”

^১. ফাতাওয়া রেয়তীয়া

^২. দুরুরে মুখতার, ফাতাওয়া রেয়তীয়া

ভূল-অপরাধ ও তদীয় হকুম আহকাম

'জিনায়াত' এটি আরবী শব্দ 'জিনায়া' এর বহুবচন। তার অর্থ অপরাধ, ভূল, দোষ, ক্ষেত্র-বিচ্যুতি ইত্যাদি বলা যায়। হজু ও ওমরাহর পরিভাষায় জিনায়াত ওই সব কাজকে বলে যা ইহরামের অবস্থায় বা হারম শরীফে করা নিষেধ।

ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

ইহরামের অবস্থায় হজু ও ওমরা পালনেচ্ছুদের এমন কিছু কার্যকলাপ নিষিদ্ধ যা সাধারণ অবস্থায় হারাম হয় না।

১. পশু-পাখি শিকার করা। শিকারকারীকে সাহায্য করা। ইশারায় শিকারী প্রাণীকে দেখিয়ে দেওয়া।

২. হারামের সীমারেখায় গাছ, ঘাস ও তরু-লতা ইত্যাদি কর্তন করা এবং মাছি, মশা, উকুন ইত্যাদি হত্যা করা।

৩. শরীর থেকে কোনো চুল, লোম উপড়ে ফেলা বা নখ কাটা।

৪. সেলাই করা কাপড় পরা। যেমন- কোর্টা, সেলোয়ার, আগুরওয়্যার, টুপি ইত্যাদি।

৫. সুগন্ধি ব্যবহার করা। যেভাবেই হোক। যেমন সুগন্ধিযুক্ত সাবান দিয়ে গোসল করা বা সুগন্ধিয়র সুরমা লাগানো। খাবার দাবারে সুগন্ধি ব্যবহার করা। যেমন- ফিরনি, পায়েশ, চাটনি, আচার বা শরবত ইত্যাদিতে। অদ্রপ সুগন্ধিযুক্ত ধূমপান ও পানিও এই হকুমের অন্তর্ভুক্ত।

৬. পুরুষের বেলায় মাথা ও চেহারা আবৃত করা। মহিলার চেহারায় কাপড় লাগে মতো ব্যবহার করা। (তবে মহিলার জন্য মাথা আবৃত রাখা জরুরী।)

৭. স্বামী-স্ত্রী দাস্পত্য সম্পর্কিত কাজকর্ম করা। যৌন ভিত্তিক কথাবার্তা বলা, যদিও তা হয় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে। এছাড়া ওই সব কথা ও আচার-আচরণ যা দ্বারা প্রবৃত্তির উৎসেজন সৃষ্টি হয় তাও।

৮. হজুর দিনসমূহে আরাফার অবস্থানের আগে নবম তারিখ পর্যন্ত নারীর সঙ্গে সহবাস করলে হজু নষ্ট হয়ে যায়। পরের বছর দু'জনের উপরই তার কায়া ওয়াজিব হয়ে যায়। তা ছাড়া অসাবধানতার কারণে দু'জনের উপরই কোরবানী দেওয়া বাঞ্ছনীয়।^১

৯. এছাড়া মুহরিমের জন্য আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানী করা, সগীরা-কাবীরা গোনাহে লিঙ্গ হওয়া এবং গালিগালাজ, মন্দ কথাবার্তা ও ঝগড়া-

ফাসাদ করা অন্য সময়ের তুলনায় মারাত্মক জঘন্য অপরাধ ও ঘৃণ্য আচরণ। এসব কাজকর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত।

অপরাধ ও ভূলের বিধান

উপরোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম থেকে যে কোনো একটিতে লিঙ্গ হলে বা হজুর ওয়াজিব কর্ম থেকে কোনো একটি বাদ গেলে জিনায়াতের আহকাম জারি হবে। ওইসব আহকাম তিনি প্রকার। ১. দম। ২. বুদনা। ৩. সাদকা।

১. দম

দম থেকে উদ্দেশ্য একটি ছাগল, ভেড়া (বা উট, গরু ইত্যাদির সঙ্গমাংশ) কোরবানী দেওয়া। যেসব কার্যকলাপের দণ্ডে দম দিতে হয় তা নিম্নরূপ-

১. ইহরামের অবস্থায় কোনো পূর্ণাঙ্গে বা ততোধিক স্থানে সুগন্ধি লাগানো।

২. সুগন্ধিযুক্ত তৈলেরও উপরোক্ত হকুম। অদ্রপ তিল, যায়তুনও খুশবূর হকুমের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাতে সুগন্ধি থাকে না। তবে তা খাওয়াতে বা নাকে দেওয়াতে এবং জখম ও ব্যথায় ব্যবহারে সাদকা ওয়াজিব হবে না।

৩. খালেস সুগন্ধি। যেমন মিশক, জাফরান, লবঙ্গ, এলাচি, দারচিনি এতে বেশী আহার করেছে যার কারণে মুখের অধিকাংশ স্থানে লেগে গিয়েছে।

৪. খাবারে সুগন্ধি মিশ্রণ করার পর তা সিদ্ধ বা রক্ষন না করে পরিবেশিত খাবারে যদি তা পরিমাণে খাবার অপেক্ষা অধিক হয়। অদ্রপ পানীয় বস্তুতেও সুগন্ধি যদি অধিক পরিমাণে হয়।

৫. মাথায় মেহেদীর হালকা কলপ করেছে যাতে চুল অদৃশ্য না হয় তখন একটি দম দিতে হবে। আর যদি এমন গাঢ় করে দেয় যাতে চুল দৃশ্যায়িত না হয় আর তা একদিন এক রাত লাগিয়ে রাখে তখন পুরুষের উপর দু'টি দম আর নারীর উপর যে কোনো অবস্থায় একটি দিতে হবে।

৬. দাঢ়িতে মেহেদী লাগালে।

৭. হাতের তালু বা পায়ের তালুতে মেহেদী লাগালে।

৮. ইহরামের অবস্থায় সেলাইকৃত কাপড় একদিন বা একরাত পরিধান করলে দম ওয়াজিব হবে। লাগাতারভাবে কয়েকদিন রাখলেও একটি ওয়াজিব হবে। তেমনি পুরো চার প্রহর ধরে মৌজা পরলেও।

৯. মাথা বা দাঢ়ির এক চতুর্থাংশ লোম বা ততোধিক কোনো উপায়ে উৎপাটন করলে দম ওয়াজিব হবে।

১০. পূর্ণ গ্রীবা ও পূর্ণ এক বগলের লোম পরিষ্কার করা, অদ্রপ নাভির তলদেশের হকুমও তাই।

- ১১.এক হাত বা এক পায়ের পঞ্চ অঙ্গুলির নখ কর্তন করা। অথবা বিশটি একসঙ্গে কাটা।
- ১২.তাওয়াফে যিয়ারাতের পূর্বে কোনো পুরুষ বা নারীকে প্রবৃত্তির তাড়নায় স্পর্শ বা চুম্বন করলে দম দিতে হবে।
- ১৩.ওকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রীসঙ্গ করলে হজু ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে বাকী কার্যকলাপ হজুর ন্যায় সম্পাদন করে দম দিতে হবে এবং আগামী বছর তা আবার কায়া দিতে হবে।
- ১৪.ওকুফে আরাফা ও হলকের পর যৌনমিলন করলে।
- ১৫.ওমরাতে চার প্রদক্ষিণের পূর্বে যৌনমিলন করলে ওমরা বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই দম এবং ওমরা কায়া দিতে হবে। আর যদি চার প্রদক্ষিণের পর করে তা হলে দম দিবে, ওমরা কায়া করতে হবে না।
- ১৬.ওমরা পালনকারী তাওয়াফ ও সাঁউর পর হলকের পূর্বে সহবাস করলে।
- ১৭.কিরান-হজু পালনকারী ওমরার তাওয়াফের পূর্বে সহবাস করলে হজু ও ওমরা দু'টিই ফাসেদ হয়ে যাবে, কিন্তু উভয়ের সকল কার্যকলাপ পালন করে যাবে এবং দম দিবে। আর পরের বছর হজু ও ওমরা আবার করবে। যদি ওমরার তাওয়াফ করে ফেলে আর আরাফার ওকুফের আগে সহবাস করে তখন ওমরা ফাসেদ হবেনা, হজু ফাসেদ হবে। দু'টি দম দিবে এবং আগামী বছর হজুর কায়া দিবে। আর যদি অকুফে আরাফার পরে করে তা হলে হজু বা ওমরা কোনোটি নষ্ট হবেনা। তবে একটি দম ও একটি বুদনা দিবে। এছাড়া কিরানের কোরবানী করবে।
- ১৮.ইহরাম ব্যতীত হারমের সীমানায় প্রবেশ করা। কিন্তু মীকাতে গিয়ে ইহরাম পরে নিলে দম দিতে হবেনা।
- ১৯.তাওয়াফে যিয়ারাতের পুরোটা বা অধিকাংশ অজু ছাড়া করলে দম ওয়াজিব হবে। তাওয়াফ পুণরায় করতে হবে।
- ২০.ওমরার তাওয়াফ পুরো বা অধিকাংশ হায়েয নেফাসের অবস্থায় করলে বা বে-অজু অবস্থায় করলে।
- ২১.তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে বিদা'র অধিকাংশ ছেড়ে দিলে অথবা তাওয়াফে বিদা' সম্পূর্ণ ত্যাগ করা হলে দম দিতে হবে। তবে হায়েওয়ালা নারীর এই তাওয়াফ জরুরী নয়। আর তাওয়াফে কুদূম না করা মাকরহ তবে দম ওয়াজিব নয়।

- ২২.পূর্ণ সাঁউ বা অধিকাংশ প্রদক্ষিণ ওজরবিহিন ছেড়ে দিলে বা যানবাহনে সওয়ার হয়ে করলে দম ওয়াজিব হবে, পুণরায় করলে দম ওয়াজিব হবে না।
 - ২৩.সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত থেকে নির্গমন করলে। তবে সূর্যাস্তের আগে আগে ফিরে এসে সূর্যাস্তের পর বের হলে দম দিতে হবে না।
 - ২৪.দশম তারিখ ভোরে মুয়দালিফায় বিনা ওয়ারে ওকুফ না করা।
 - ২৫.কোনো দিন কংকর নিক্ষেপ না করা অথবা পূর্ণ একদিন বা ততোধিক কংকর নিক্ষেপ না করা।
 - ২৬.হারমের সীমানার বাইরে হলক বা রমীর পূর্বে হলক করা অথবা কারিন ও মুতামাতি কোরবানীর পূর্বে হলক করা অথবা তারা উভয়ে রমীর পূর্বে কোরবানী করা।
 - ২৭.মাথা মুণ্ডানোতে এতো বিলম্ব করা যে কুরবানীর দিনই অতিবাহিত হয়ে যায়।
 - ২৮.তাওয়াফে যিয়ারাতে বিলম্ব করা।
- ### ২. বুদনা
- বুদনা থেকে উদ্দেশ্য পূর্ণ একটি গাভী বা উট যবাই করে সাদকা দেওয়া। তা নিম্নলিখিত কারণে ওয়াজিব হয়।
- ১.হায়য- নিফাস ও জানাবাতের সময় তাওয়াফে যিয়ারত করা।
 - ২.আরাফায় অবস্থানের পর হলকের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করা। (কিন্তু তাতে কায়া দিতে হবে)
- ### ৩. সাদকা
- সাদকা অর্থ কিছু গম বা শস্য ইত্যাদি কোনো দরিদ্রকে দান করে দেওয়া। এই সাদকা সাদকাতুল ফিতরের সমান গম (প্রায় সোয়া দু'সের) বা তৎপরিমাণ মূল্য। আবার কখনো তার চেয়ে কম।
- যে সমস্ত কারণে সাদকা ওয়াজিব হয়-
- ১.একটি অঙ্গের চেয়ে কম স্থানে সুগন্ধি লাগানো।
 - ২.একদিনের চেয়ে কম সময়ে সেলাইকৃত কাপড় পরা।
 - ৩.এক দিনের চেয়ে কম সময়ে মাথা ঢেকে রাখা।
 - ৪.মাথার চুল বা দাঢ়ির একচতুর্থাংশের চেয়ে কম মুণ্ডানো।
 - ৫.মাথা, দাঢ়ি, গ্রীবা, বগল ও নাভির তলদেশের লোম ব্যতীত অন্যন্য অঙ্গের লোপ উপড়ানো।

৬. সমস্ত গোঁফ বা অগ্নি মুণ্ডানো বা কর্তন করা।
৭. ইহরামের অবস্থায় এমন লোকের মাথা মুণ্ডানো যে ইহরামে আছে।
৮. পাঁচ অঙ্গুলির চেয়ে কম পরিমাণ নখ কাটা, প্রতিটি নখের বিপরীতে সোয়া দু'সের দিতে হবে।
৯. তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে সদর বে-অজু করা।
১০. তিন জামরা থেকে কোনো এক জামরার কোনো কংকর নিষ্কেপন বাদ যাওয়া, প্রতিটি কংকরের বিপরীতে সোয়া দু'সের দিতে হবে এক দিনের রমী পূর্ণ হওয়ার আগে আগে।
১১. জোক বা ফড়িং ইত্যাদি হত্যা করলে সোয়া দু'সেরের চেয়ে কম ওয়াজিব হবে। তাই তাতে যা ইচ্ছা হয় সদকা করতে পারবে।
১২. যদি কেউ ইহরামের অবস্থায় নিজে শিকার করেছে বা শিকারীকে শিকার প্রাণীর ব্যাপারে তথ্য বা পরামর্শ দিয়েছে তখন তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে। দণ্ড এই- যেখানে ওই পশু শিকার করা হয়েছে সেখানে তার মূল্য নির্ধারণ করবে। মূল্য যদি কোরবানীর পশুর পরিমাণ হয়ে থাকে তা হলে তার ইখতিয়ার ও ইচ্ছা সে চাইলে প্রাণী ক্রয় করে যবাই করতে পারবে চাইলে শস্য ক্রয় করে সাদকা করতে পারবে।
১৩. হারামের ঘাস বা স্বজন্মানো উত্তিদ উপরে ফেললেও তার মূল্য সাদকা করা ওয়াজিব।

দু'টি শুরুত্বপূর্ণ কথা

১. যেখানে দমের হৃকুম আছে, ওই অপরাধ বা দোষ যদি রোগ-ব্যাধি বা উক্তগু তাপদহ বা কনকনে ঠাণ্ডা বা জখম, ফোঁড়া অথবা জোঁকের উপদ্রবের কারণে হয়ে থাকে তা হলে তাকে অনিচ্ছামূলক ভুল বলা হবে। এমতাবস্থায় তার এখতিয়ার আছে যে, সে চাইলে দমের পরিবর্তে ৬টি গরীব-মিসকীনকে সদকা করে দিবে অথবা ৩টি রোয়া রাখবে। আর যদি ওই ভুলের কারণে সদকার হৃকুম হয় আর তা বাধ্য হয়ে করে তা হলে তার এখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা হলে সাদকার পরিবর্তে একটি রোয়া রাখতে পারবে।

২. ভুলে ও অনিচ্ছায় বা ঘুমের অবস্থায় অথবা বাধ্যতামূলকভাবে যদি কোনো অপরাধ হয়ে যায় তখন কাফফারা দিয়ে কলুষমুক্ত ও পবিত্র হয়ে যাওয়া চাই। জেনে বুঝে ও বিনা ওজরে অপরাধ করা এবং কাফফারা আদায় করে দেওয়ার কথা বলা এটি স্বেচ্ছায় আল্লাহর হৃকুমের বিরোধিতা করার কঠিন গোনাহ হবে। যদিও এমতাবস্থায়ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। আল্লাহর পানাহ!

নবম অধ্যায়

পবিত্র মুক্তি নগরীর ফর্মালত

মানবতার ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতির ধাপসমূহের একটি বিন্যস্ত ইতিহাসের পটভূমি মুক্তি নগরী। হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে এটা একটি বিশেষ গোত্রের দাওয়াতী মারকায ছিল। অতঃপর হ্যরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের যুগে কয়েকটি পটাবাস ও ক্ষুদ্র কুটিরের ছেট পল্লীতে রূপ নেয়। ক্রমান্বয়ে তা আরববাসীর ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং দুজাহানের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রকাশের পর গোটা মুসলিম বিশ্বের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। কুরআনে করিমে ঘোষণা দিয়েছে যে, গোটা হারম তথা মুক্তি নগরীর চারিপাশে কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ড পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ জনপদ করে দেয়া হয়েছে। শুধু হেজাজ কিংবা আরব থেকে নয়; বরং বিশ্বের সকল দেশ, প্রদেশ এবং শহর ও নগর থেকে মানুষ মাতাল ও মাতোয়ারা হয়ে মুক্তায় আসে এবং স্বীয় পাপরাশি মোচন করার ব্যবস্থা করে। এ ধারাবাহিকতা দশ-বিশ বছর পূর্বের নয়; বরং হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় তথা প্রায় চার হাজার বছর আদিকাল থেকে চলে আসছে। হারম সকল ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ মুক্ত নিরাপদ জনপদ হওয়ার একটি উজ্জ্বল হারাম নয়; বরং চতুর্পাঞ্চের সকল জমি হারামের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে মানবহত্যার কথা দূরে থাক প্রাণী শিকার করারও অনুমতি নেই। এটাতো ইসলাম ধর্মের বিধান কিন্তু জাহেলিয়া যুগেও এটা শাস্তি ও নিরাপত্তা নগরী বলে বিশ্বাস করা হত। মুশরিকদের শাসনামলেও অনেকেই জঘন্যতম অপরাধে জড়িত হওয়ার পর কা'বাগুহের অভ্যন্তরে চুকে নিরাপত্তা হাসিল করত।

হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বাগুহ নির্মাণকালে তাঁর দোয়াসমূহের মধ্যে এ দোয়াও করেছিলেন যে, হে রব! এ জনপদকে (মুক্তি নগরী) নিরাপদ বানিয়ে দিন। এটা আসলে একটি মু'জিয়া। হারম, মুক্তি নগরী ও তাঁর উপকর্ত এলাকাসমূহ নিরাপত্তার বিচারে নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই। যেখানে কোন দস্যবৃত্তি ও লুটতরাজ ঘটেনা, কোন কাফেলা বিনাশ হয় না এবং কোন লাশ প্রাণান্তে ধড়ফড় করতেও দৃষ্টিগোচর হয়না; বরং খোদ ঘাতক যদি কা'বাগুহে আশ্রয় নেয় তাকেও সেখানে হত্যা করা হয়না। তীর্থভূমি মুক্তি নগরী ও পবিত্র ঘর কা'বার এতটুকু সম্মান সর্বকালে আরব মুশরিকদের কাছেও স্বীকৃত ছিল। হ্যরত ইবরাহীম

আলাইহিস সালামের দ্বিতীয় দোয়া এই ছিল যে, “হে রব! মক্কার অধিবাসীদের জন্য হরেক রকমের ফল-ফলাদির ব্যবস্থা করে দিন।” বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে, মক্কার জমি হয়ত বালুকাময় কিংবা প্রস্তরময়, বৃষ্টি বর্ষণও হয় অতি স্বল্প পরিমাণে, আর চাষাবাদ কিংবা উদ্যান - পরিচর্যা তো কেউ জানেই না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেখানে সবধরনের তাজা ফল ও শাক-সবজী অন্যায়েই পাওয়া যায়। সারকথা হল মক্কানগরীতে বিদ্যমান বাইতুল্লাহ অতি প্রাচীনকাল থেকেই আরববাসীর কাছে পবিত্র তীর্থস্থান এবং উপাসনালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। সর্বপ্রথমে হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম এর গোড়াপত্তন করেন এবং তা ভেঙ্গে-চূরে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নবরূপে নির্মাণ করেছেন। কুরআন মজীদ কা'বা গৃহকে পৃথিবীর বুকের ওপর সর্বপ্রথম উপাসনালয় বা ইবাদতস্থল বলে ঘোষণা দিয়েছে। তা থেকে এটাও জানা যায় যে, কা'বা শরীফ বাইতুল মাকদাসের চেয়েও অতি প্রাচীন বাক্সা, যেখানে বস্ত্রগত, ধর্মীয়, রূহানী ও দুনিয়াবী সব ধরনের বরকতের সমাবেশ ঘটেছে। ‘বাক্সা’ এটা মক্কা নগরীরই অপর নাম। কুরআন করীম ও হাদীস শরীফের পাতায় পাতায় এই পবিত্র নগরী ও পবিত্র গৃহের স্থায়ী শ্রেষ্ঠতা, শুচিতা ও উৎকৃষ্টতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যতদিন পর্যন্ত এই উম্মত হারমের ইজ্জত-আবরু পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করবে তারা কল্যাণের পথে থাকবে। আর যখন তারা হারমের সম্মান নষ্ট করতে শুরু করবে তারা ধৰ্মসের সম্মুখীন হবে।^১

এটা সেই নগরী যা রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাত্ভূমি ও জন্মভূমি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এখান থেকে ইসলামের কলকষ্ট ধ্বনিত হয়েছে এবং এখন থেকেই ইসলামী শিক্ষার শুভযাত্রা শুরু হয়েছে। যে নূর এখান থেকে প্রকাশ পেয়েছে সে নূরই সর্বদা মুসলমানদের অন্তরে আলো বিতরণ করে যাচ্ছে। এটা সেই বরকতময় নগরী যেখানে ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা বাইতুল্লাহর উপর আক্রমণ চালানোর দুঃসাহস দেখালে সে সৈন্যসহ বিনাশ হয় এবং তার গৃহীত সব পরিকল্পনা পাল্টে যায়। ঘটনা এই ছিল যে, অকস্মাত সমুদ্রের দিক থেকে পাঞ্জা এবং ঠোঁটে পাথরসহ একদল আবাবীল পক্ষ আসে। তাদের পাথরগুলি যাদের গায়ে পড়ত তাদের দেহকে ফুড়ে অপর দিকে বেরিয়ে আসত এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৎক্ষণাত গলে যেত ও দুর্গন্ধ ছড়াত। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো বাহিনী নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থা দেখে

আবরাহা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়ে এবং ইয়েমেনে পালিয়ে যায়। সেখানে পৌছে মাত্র সেও ধ্বংস হয়ে যায়।

এ ঘটনাটি পবিত্র কা'বা গৃহের মর্যাদাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে এবং তার সম্মানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মক্কা নগরীর যিয়ারতসমূহ

বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান মক্কা নগরীকে সুসজ্জিত ও ঐতিহ্যবহ করে তুলেছে। সেই স্থানসমূহ আরবী ভাষায় ‘যিয়ারত’ নামে পরিচিত। যিয়ারত ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বলদিকের জীবিত জগত চির। বর্তমানে যদিও সেই স্থানসমূহের মূলচিত্র অবশিষ্ট নেই তবুও সেগুলির যিয়ারত করলে এবং সেখানে গিয়ে মুসলিম উম্মহের জন্য দোয়া করলে বরকত ও কল্যাণের আশা করা যায়। সেই স্থানসমূহের কিছু আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

১. আবৃ কুবাইস পর্বত

এটা মক্কা নগরীর অন্যতম প্রসিদ্ধ পর্বত। মসজিদে হারামের পূর্বদিকে সাফা পর্বতের নিকটে অবস্থিত। সমুদ্রেপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৭৫ মিটার। হ্যরত ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক বর্ণনা মতে এটা ভূমণ্ডলের সর্বপ্রথম পাহাড়। অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর হাজরে আসওয়াদ (কালো পাহাড়) সেখানে আমানতস্বরূপ সংরক্ষিত ছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রসিদ্ধ মু'জিয়া সেই পাহাড়ে প্রকাশ পেয়েছে। সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি চন্দ্র বিদীর্ঘ হতে দেখেছি তার এক টুকরো পড়ে ছিল আবৃ কুবাইস পর্বতে এবং অপর টুকরো কদার উপর। সেখানে মসজিদে বেলাল নামে একটি ছোট মসজিদও আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে, তার নাম মসজিদে হেলাল বা চন্দ্র মসজিদ। কেননা সে স্থানে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখা হয় এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মু'জিয়াও সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, সে পাহাড়ে দোয়া করুল হয়। মক্কাবাসীগণ দুর্ভিক্ষকালে পাহাড়ে চড়ে দোয়া করে।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্মস্থান

আবৃ কুবাইস পর্বতের পাদদেশে কশাশিয়া এলাকার সূকুল লায়ল নামক গলিতে এ জায়গাটি অবস্থিত। এটা সেই পবিত্রস্থান যেখানে বিশ্বের নয়নমণি সত্যের দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। এ জায়গাটি হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন শ্রদ্ধেয় পিতা হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল

^১. সুনানে ইবনে মাজাহ

মুত্তালিবের নিকট থেকে উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করেন। হিজরতের সময় হ্যরত আকীল বিন আবু তালিব এ জায়গাটি হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট থেকে নিয়ে নিজগৃহের অংশ বানিয়ে নেন এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আচ্ছাকাফীর কাছে বিক্রি করে দেন। ১৭১ হিজরী সনে খলীফা হারানুর রশীদের মাতা আল-খাইজান এ জায়গাটি মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে খরিদ করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে দেন এবং সেখানে নামায পড়া শুরু হয়। বর্তমানে উক্ত জায়গায় একটি গ্রাম্য দেখা যায় এবং স্থানটি শি'আবে আবি তালিবের অন্তর্ভুক্ত।

৩. বনু হাশেমের মহল্লা

আবু কুবাইস পর্বতের নিম্নভূমিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্মস্থানের দক্ষিণে মরুপথের মধ্যে এ স্থানটি অবস্থিত। সে স্থানের প্রতিটি প্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রেমিকদের জন্য বরকত ও কল্যাণের আধার। প্রাচীনকালের কিছু জীর্ণ-শীর্ণ গৃহ ও মরুপথ সেখানে দৃষ্টিগোচর হয়। কুরাইশ গোত্র সে স্থানেই বসবাসরত ছিল। বনু হাশেমের গোত্রীয় শাসক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামহ হ্যরত আব্দুল মুত্তালিবও সেখানে বসবাস করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পূর্বসূরী এবং হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই জীবনযাপন করেছেন। এটা সেই জনপদ যেখানে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর গোত্রীয় লোকজন বয়কটের তিনটি বৎসর খুব ধৈর্য-সহিষ্ণুতার সাথে নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থেকে কাটিয়েছেন।

৪. খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘর

এটা হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বিশ্বস্ত ও আস্ত্রাভাজন জীবন-সঙ্গী হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ী, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। জান্নাতের শাহজাদী সাইয়েদা হ্যরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে ভূমিষ্ঠ হন। হারাম শরীফের পর মক্কা নগরীতে এটা দ্বিতীয় ফরীদতপূর্ণ স্থান। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ সংরক্ষিত কক্ষ ছিল যেখানে তিনি স্বীয় রবের ইবাদত-উপাসনায় নিমগ্ন থাকতেন এবং ওহীও সেখানে নাযিল হত। বর্তমানে সে জায়গায় হেফজখানা নির্মাণ করা হয়েছে।

৫. জান্নাতুল মু'আল্লা

এটা মক্কা নগরীর ঐতিহাসিক কবরস্থান। ছয় হাজার বিখ্যাত ও বুর্য সাহাবী সেখানে সমাহিত হয়েছেন। মসজিদে হারামের উত্তর পূর্ব দিকে প্রায় এক মাইল দূরে মিনায় যাওয়ার পথে এ স্থানটি পড়ে। মদীনা মুনাওয়ারাহ'র জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থানের পর এর স্থান। বর্তমানে গোরস্থানটি দু'ভাগে বিভক্ত করে মধ্যখানে সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। পুরনো অংশে উম্মুল মুমিনীন হ্যরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজার আছে। পূর্বে কোন এক সময় মাজারে গম্বুজ ছিল যা এখন ভেঙে দেয়া হয়েছে। সেখানে সাহাবারে কেরাম ছাড়া আরো বহু তাবেবীন ওলী-বুর্য এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণ শায়িত আছেন। তাছাড়া হ্যরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হ্যরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামহ হ্যরত আব্দুল মুত্তালিব, পিতৃব্য হ্যরত আবু তালিব, হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, হ্যরত ফুয়াইল বিন আয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু, হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহেবজাদা হ্যরত কাসেম রাদিয়াল্লাহু আনহু, হ্যরত তাহের রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হ্যরত তৈয়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সমাধি সেখানে বিদ্যমান।

৬. হ্যরত আবু বকর ছিদ্রীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসগৃহ

মিসফালাহ নামক এলাকায় হারামের দিক থেকে প্রবেশ করতে ডানদিকে স্বর্ণকারদের গলিতে এ স্থানটি অবস্থিত। সেখানে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুবার তাশরীফ এনেছিলেন এবং যেখান থেকেই হিজরতের উদ্দেশ্যে ছাওর পর্বত অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। হ্যরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হ্যরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হ্যরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সেখানে ইসলাম ধর্মের দীক্ষা লাভ করেন। এখন সে স্থানে হ্যরত আবু বকর ছিদ্রীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে 'মসজিদে আবু বকর' হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

৭. দারে আরকাম

এটা প্রখ্যাত সাহাবী হ্যরত আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাসগৃহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম দাওয়াতি মারকায। হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হ্যরত হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ প্রখ্যাত ছাহাবী সেখানে ইসলামের দীক্ষা লাভ করেন। সাফা পর্বতের দিকে মসজিদে হারামের প্রথম দরোজার সম্মুখে এ গৃহটি অবস্থিত। সে দরোজার মেহরাবে "দারে

আরকাম” লেখা আছে। হারাম শরীফকে প্রশস্ত করার সময় এটা মসজিদের চতুর্বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকে পড়েছে, তাই এখন দারে আরকামের কোন নির্দর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮. হেরা গুহা

মক্কা নগরী থেকে উত্তর দিকে প্রায় সাত মাইল দূরত্বে জাবলে নূরের (প্রাচীন নাম জাবলে হেরা) চূড়ায় ২শত মিটার উচুতে এ গুহাটি অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট (প্রায়) এবং প্রস্থ ১০ ফুট। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে মহান রবের স্মরণে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং সর্বপ্রথম ওহীও সেখানে অবতীর্ণ হয়। এই গুহাটির প্রবেশদ্বার কেবলার দিকে।

৯. ছাওর গুহা

এ গুহাটি মক্কা নগরীর দক্ষিণে প্রায় সাত মাইল দূরে ছাওর পর্বতের শৃঙ্গে অবস্থিত। যা মাটি থেকে প্রায় দেড় মাইল ওপরে। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার সময় হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সেখানে তিন দিন যাবৎ অবস্থান করেছিলেন। সেই গুহা পর্যন্ত আরোহন করতে প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগে। বল-শক্তিহীন ও রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি সেই পাহাড় আরোহন করা খুবই ভয়ঙ্কর ও আশঙ্কাজনক।

১০. মুরসালাত গুহা

এটা মসজিদ খাইফের অদূরে অবস্থিত। আরাফাতে গমনকালে রাস্তার ডানপার্শে পড়ে। সূরা মুরসালাত সেখানে নাযিল হয়। সেই গুহা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী শিরের চিহ্ন আছে।

১১. জাবলে রহমত

আরাফাত প্রাত্তরের গা ঘেষে এ পাহাড়টি অবস্থিত। বিদায় হজুরের ভাষণ নামে খ্যাত হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের মূল্যবান ও সর্বশেষ ভাষণটি এই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে প্রদান করেছিলেন যা মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ও অমূল্য পাথেয়। এটা পাহাড়টির বিশেষ ফয়লত।

১২. নমিরাহ মসজিদ

এ মসজিদটি মক্কা নগরীর পূর্বদিকে আরাফাত প্রাত্তরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। মসজিদে আরাফা এবং মসজিদে ইবরাহীম এই দুই নামেও পরিচিত। হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। বিদায় হজুরের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে হজুরের দ্বিতীয় দিন তথা ৯ই

জিলহজু সেই মসজিদে একত্রে জোহর ও আসরের নামায আদায় করে এবং সেখানে একত্রে তিন লক্ষ জনতা নামায আদায় করতে পারে।

১৩. মসজিদে মুয়দালিফা

এটা কুয়া পর্বতের নিকটবর্তী মুয়দালিফা ময়দানে অবস্থিত। এটার অপর নাম মসজিদে মাশআরাহ হারাম। এখন যে স্থানে মসজিদটি অবস্থিত সে স্থানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজুরের সময় জিকির ফিকির এবং স্বীয় রবের ইবাদতে নিমগ্ন থেকে মুয়দালিফার সারাটি রাত অতিবাহিত করেছিলেন।

১৪. মসজিদে খাইফ

এটা মিনায় জমরায়ে সুগরার নিকটে অবস্থিত। খাইফ পর্বতের পাদদেশকে বলা হয়। যেহেতু এই মসজিদটি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত তাই এটাকে মসজিদে খাইফ বলা হয়। কথিত আছে যে, সেখানে সন্দরঞ্জন নবী শায়িত আছেন। মসজিদের মধ্যভাগে একটি গম্বুজ আছে। সেই গম্বুজস্থল সম্পর্কে বলা হয় যে, অনেক নবী-রাসূল সেখানে নামায আদায় করেছেন। বিদায় হজুরের সময় হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিবিরও সেখানেই স্থাপন করা হয়। মসজিদটিতে এক সাথে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষের নামাযের জায়গার সংস্থান হয়।

১৫. মসজিদে আয়েশা

মসজিদে হারাম থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে পবিত্র মদীনার পথে আছে তানসৈম নামক একটি উপত্যকা। সেখানে এ মসজিদটি অবস্থিত। এটা হারমের সীমার বাইরে। এটা সেই স্থান যেখান থেকে দশম হিজরীতে উম্মুল মুমিনীন হ্যরত আয়েশা ছিদ্রিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতিক্রমে ওমরার জন্য ইহরাম পরিধান করেছিলেন। মক্কা নগরীতে বসবাসরত যে সব লোকের ওমরা করতে অভিলাষ জাগে তারা নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে এখানে চলে এসে ইহরাম বাঁধে অতঃপর ওমরা আদায় করে।

১৬. মসজিদে রায়া

এটা দরিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। আরবী ভাষায় রায়া অর্থ ঝাঙা ও পতাকা। কথিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের অভিযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানে ঝাঙা উড়ীন করেছিলেন। আয়রকী বর্ণনা করেন যে, হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন ওবায়দুল্লাহ বিন আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথমে এই মসজিদের ভিত্তি

প্রস্তর রাখেন। পরবর্তীতে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আয়ীয় এটাকে আরো সুন্দর জমকালো ও উন্নত করে নির্মাণ করেন।

১৭. মসজিদে জিন

এটাকে মসজিদে বাইআত এবং মসজিদে হারসও বলা হয়। জান্নাতুল মুআল্লাহর নিকটে অবস্থিত। এ স্থানে জিন জাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাতে শিষ্যত্ব বরণ করেন, যার ঘটনা কুরআন মজীদের সূরা জিনে উল্লেখ আছে। সে সময় এটা ছিল একটি উচ্চুক্ত প্রান্তর। অন্যান্য পবিত্র ভূমির ন্যায় এটাও একটি উৎকৃষ্ট ও সম্মানিত স্থান।

উপরিউক্ত স্থানগুলো ছাড়া মক্কা নগরী ও তার আশেপাশে অবস্থিত নিম্নের স্থানগুলোর যিয়ারত করা উচিত। মসজিদ হামযাহ, মসজিদে শাজরাহ, মসজিদে সুকুল লাইল, মসজিদে ইজাবত, আবু কুবাইস পর্বতের মসজিদ, মসজিদে কাউসার, মসজিদে বেলাল, ও আকাবার মসজিদ, জিরানার মসজিদ, মসজিদুন নাহর, মসজিদুল কাবশ কিংবা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)'র কোরবানী স্থলের মসজিদ, মসজিদে শাকুল কমর, মসজিদে খালেদ বিন ওয়ালীদ, সাইয়েদা হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবরস্থান, কিল্লা-ই আজয়াদ বাইতুস সিকাফ ইত্যাদি। কোন কোন স্থান মসজিদকে প্রশংস্ত করার সময় মসজিদের চতুর্বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

দশম অধ্যায়

মদীনা মুনাওয়ারার ফয়েলত

মদীনা মুনাওয়ারাহ সেই নিকলুষ ও পুতঃপবিত্র নগরী যার ফাযায়েল ও শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নরূপ-

১. দুজাহানের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী রওজা সেখানে বিদ্যমান। যার জন্য উৎসর্গ ও নিবেদিত লক্ষ-কোটি মুসলমানের প্রাণ।
২. মহিমান্বিত ফেরেশতারা তার অলি-গলির পাহারা দেয়। অভিশঙ্গ দাজ্জাল সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না এবং প্রেগ ও মহামারীর আবির্ভাবও হবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)
৩. সর্বাধিক উৎকৃষ্ট ও বরকতময় নগরী। (বুখারী ও মুসলিম)
৪. সে নগরী মানুষকে এমন পাকসাফ ও কুলুষমুক্ত করে যেরূপ ভাটি লোহাকে নির্মল ও জংমুক্ত করে। (বুখারী ও মুসলিম)
৫. যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর সাথে ফেরেববাজি ও প্রতারণা করবে সে এমনভাবে ধ্বংস ও বিনাশ হয়ে যাবে যেভাবে লবণ পানির সাথে মিশে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)
৬. যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদেরকে ভয় দেখাবে আল্লাহ তাআলা তাকে ভয়-ভীতিতে গ্রেফতার করবেন। (বুখারী ও মুসলিম)।
৭. যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের উপার জুলুম নিপীড়ন চালাবে এবং তাদেরকে শক্তি করবে সে নিজেই ভয় ও আশঙ্কায় পতিত হবে, তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাজাতি এবং সকল মানবজাতির অভিসম্পত্তি। তাছাড়া তার ফরয-নফল কোন ইবাদতই করুল হবেন। (তিবরানী, নাসাই)
৮. এটা সেই তীর্থভূমি যেটাকে আল্লাহ রাবুল আলামীন তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত স্থল হওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)
৯. যে ব্যক্তি মদীনার কষ্ট ক্লেশ ও বিপদ সংকটে অটল অবিচল থাকবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য সুপারিশ করবেন। (মুসলিম)
১০. যে ব্যক্তি মদীনার জমিনে মৃত্যুবরণ করবে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ লাভ করবে এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। (জামে তিরমিয়ী)

১১.এ. শহরের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন।

ক.হে রব! আপনি আমাদের খেজুরে বরকত দান করুন।

খ.আমাদের ওজন ও পরিমাপে বরকত দান করুন।

গ.আমাদের শহরে বরকত নাফিল করুন।

ঘ.হে আল্লাহ! নিচয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আপনার বান্দা, আপনার বন্ধু এবং আপনার নবী, এবং আমি আপনার বান্দা ও আপনার নবী। তিনি আপনার কাছে মক্কা নগরীর জন্য কল্যাণের প্রার্থনা করেছিলেন এবং আমি মদীনার জন্য তার দ্বিগুণ কল্যাণ ও বরকতের প্রার্থনা করছি। (মুসলিম ইত্যাদি)

ঙ.হে আল্লাহ! মক্কা নগরী যেরূপ আমাদের নিকট প্রিয়, সেরূপ বরং তদাপেক্ষা বেশি মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দিন। আমাদের অন্তরে মদীনার পরিবেশের মুহার্বত দান করুন। তার ওজন ও পরিমাপে বরকত দান করুন এবং এখানকার সকল রোগ ব্যাধি ‘জুহফা’ নামক হানে পাঠিয়ে দিন।

যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের কাছে মদীনার আবহাওয়া অনুকূল ও অনুপযোগী মনে হল তখনই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছিলেন। ইতিপূর্বে মদীনাতে প্রবলভাবে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল তাই এটাকে ইয়াসরিব বা প্রতিকূল পরিবেশ বিশিষ্ট লোকালয় বলা হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদচারণার বরকতে তা নূরানী মদীনা ও পবিত্র মদীনায় পরিণত হয়েছে। এখন তা প্রতিকূল পরিবেশ বিশিষ্ট নয়; বরং পবিত্র ও স্বচ্ছ আবহাওয়া সম্পন্ন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক যিয়ারত করার ফয়লত

পবিত্র বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও হজ্রের অন্যান্য বিধি-বিধান থেকে ফারেগ হওয়ার পর সত্য প্রেমিকগণ কা'বার কা'বা তথা রওজা মোবারকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। তারা অধীর আগ্রহে, ব্যাকুল হৃদয়ে, অশ্রুসিঙ্গ নয়নে অজস্র ভক্তি-শুক্রা ও মাহাত্ম্য বুকে ভরে তাদের মনিব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুয়ারে ধীরে ধীরে এসে পড়ে, যেখানে দেহ নয় বরং প্রেমিকের আত্মা হজ্রত পালন করে।

حاجِ آوَ شَهْنَاهَ كَارُوفَ دِيكُو ☆ كعبَةٌ تَوْكِيدٌ عَلَى بَعْدِ دِيكُو
-হে হাজীগণ! এসো, দু'জাহানের স্থ্রাট প্রিয় নবীর নূরানী রওজা দেখে যাও। পবিত্র কাবাঘর তো দেখেছ কা'বার কা'বাকে একটু দেখে যাও।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারক যে ফয়লত ও বরকতের ঝরণাধারা তা তো একটি স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। সে সম্পর্কে কোন আলোচনার অবকাশ নেই। তা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাণী উল্লেখ করছি।

-**مَنْ زَارَ قَبْرِيَ وَجَبَتْ لَهُ سَفَاعَتِي.**

১. যে ব্যক্তি আমার রওজার যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত।^১

-**مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيَ بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمْنَ زَارَنِي فِي حَيَاتِي.**

২. যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পরে হজু আদায় করেছে। অতঃপর আমার রওজার যিয়ারত করেছে সে আমার জীবন্দশায় আমার যিয়ারত করেছে।^২

-**مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِي فِي مَسْجِدِي كُبَيْتَ لَهُ حَجَّتَانِ مَبْرُورَتَانِ.**

৩. যে ব্যক্তি মক্কায় হজু পালন করেছে, অতঃপর আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার মসজিদে গমন করেছে, তাকে দুইটি মকবুল হজ্রের সওয়াব দান করা হবে।^৩

এত বড় সুসংবাদ শোনা সত্ত্বেও যার হৃদয় গলে না এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরা দেয় না তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কে হতে পারে। এমন লোকদের ব্যাপারেই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُنِ فَقَدْ جَفَانِ.

-যে ব্যক্তি হজু করেছে কিন্তু আমার যিয়ারত করেনি সে আমার সাথে জুলুমের আচরণ করেছে।^৪

^১. বায়হাকী : গুআবুল দৈমান, ৬/৫১, হাদীস : ৩৮৬২

^২. তাবরানী : আল-মু'জামুল কবির, ১১/১৫২, হাদীস : ১৮৬

^৩. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ৫/১৩৫, হাদীস : ১২৩৭০

^৪. হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ৫/১৩৫, হাদীস : ১২৩৬৯

مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَرْزُقْ فَقَدْ جَفَانِ.

-যে ব্যক্তি মদীনায় যাওয়ার শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার যিয়ারতে আসেনি। (অর্থাৎ কেবল হজু পালন করে চলে গেল) সে আমার সাথে অমানবিক আচরণ করেছে।

কুরআনে কারীম কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে সে মহান রওজার যিয়ারতের জন্য উদ্বৃদ্ধ করবে এবং অনুপ্রেরণা যোগাবে। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَآتَسْتَغْفِرَ

لَهُمْ أَلْرَسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا

-আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসে অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেন অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পাবে।^۱

ওলামায়ে কেরাম বলেন, অত্র আয়াতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পূর্ববর্তী ও ওফাত পরবর্তী উভয় অবস্থাকে শামিল করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকের যিয়ারত করা ওয়াজিবের কাছাকাছি।

কায়ী আয়ায শিফা নামক গ্রন্থে বলেন, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে যাওয়া ওয়াজিব। কেননা তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান নিহিত আছে। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তো ওয়াজিব। তাই ইমাম কুস্ত্রলানী বলেন, যে ব্যক্তি শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রওজা মোবারকের যিয়ারতে যায় না সে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুলুমের আচরণ করে। যেমন ইতিপূর্বে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম লিখেন, যে জমির বুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত আছেন তার মান-মর্যাদা আরশ ও কুরসির চেয়েও বেশি। তাই হজ্রে

যাবতীয় কার্যকলাপ আদায় করার পর রওজা মোবারকের যিয়ারতে যাওয়া প্রত্যেক হাজীর জন্য উচিত। এটা দীন দুনিয়া উভয়ে সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

মদীনা মুনাওয়ারার সফর

হজু ওমরার বিধি-বিধান পালন করার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের জন্য প্রেমিকের অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তাই সে চলে যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরা দিতে। যদ্বা থেকে মদীনার দূরত্ব ২৭৭ মাইল। স্থলযান তা প্রায় সাত আট ঘণ্টায় অতিক্রম করতে পারে। যারা মদীনায় সফর করতে চায় তাদের উচিত সফরের সূচনালগ্নে নিজের ধ্যান-খেয়ালকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট রওজার প্রতি নিবিষ্ট রাখা এবং সফর চলাকালীন দরজদ ও সালাম পাঠ করতে থাকা। যখন আমরা সফর শুরু করি তখন মনশক্ষ দ্বারা দেখতে পাই যে, যদ্বা ফারান পর্বতের চূড়ায় নবুওয়াতের সূর্য উদিত হয়েছে, অতঃপর মদীনার দিগন্তে এভাবে দীপ্তি ছড়িয়েছে যে, পুরো ভূমণ্ডল তার আলোয় উদ্ভাসিত ও প্রোজেক্ট হয়ে ওঠে। সত্যের দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো দুনিয়াকে সত্যের বার্তা পৌছিয়েছেন, তিনি যদ্বা নগরীতে ঐ সময় সত্যের দাওয়াতের প্রচার করেন সর্বদিক থেকে। সে দাওয়াতের উত্তর ছিল ইট পাথরের কিছু কণা এবং শান্তি তরাবারির কিছু আঘাত। যখন যদ্বা নগরীর পরিবেশ ইসলাম প্রচারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং কুরাইশের কাফেররা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আবাসগৃহ অবস্থাক করে, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হৃকুমে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হ্যরত আবু বকর ছিদ্রিকসহ মদীনায় হিজরত করেন। তিনি দিন যাবৎ গারে-ছাওরে অবস্থান করার পর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। পথের পর পথ অতিক্রম করে ‘কোবা’ পর্যন্ত পৌছে গেলেন। অতঃপর প্রেমিকদের একদল সহ পবিত্র মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। অপরদিকে মাহবুবের দিদারের আগ্রহে অধীর অনেক প্রেমিক শহর থেকে বের হয়ে পথ পাহারা দিতে দিতে প্রতীক্ষার প্রহর গৃণে। পরে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবর্ধনা ও অভ্যর্থনা জানায় যা এক মনোমুক্তকর ও অন্তুলনীয় আবেগ উদ্যম এবং বিশ্বাস ও সম্মাননার এক অপূর্ব নমুনা।

বন্ধু নাজ্জারের ছেট ছেট নিষ্পাপ বালিকারা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে কবিতার ছন্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবর্ধনা জানিয়েছে-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا - مِنْ نَيَّاتِ الْوَدَاعِ ★ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا - مَا دَعَاهُ اللَّهُ دَاعِ

-বিদা পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে আমাদের উপর পূর্ণিমার প্রোজ্বল চন্দ্ৰ উদিত হয়েছে। আমাদের উপর খোদার শোকর আদায় করা ওয়াজিব, যতক্ষণ পৃথিবীতে খোদার পথে কোন দায়ী থাকবে।'

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় যে বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সে বাড়ীর মালিক আনসারী সাহাবীর শত তামান্না ও দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল যে, হায়! হ্যুর যদি আমার বাড়ীতে তাশরীফ আনতেন! কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার এই উদ্ধৃতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত। সে যেখানেই বসে যাবে আমি সেখানেই অবস্থান করব। চলতে চলতে উদ্ধৃত হয়েরত আবু আয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বার প্রাপ্তে এসে বসে পড়ে। তাই হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্ধৃত থেকে অবতরণ করে হয়েরত আবু আয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ীতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানেই অবস্থান করেছেন।

যেহেতু গোটা বিশ্ব জাহানের রহমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাজারের এলাকায় অবস্থান করেছেন তাই তাদের আনন্দের কোন সীমা ছিল না। আনন্দ প্রকাশে ছোট ছোট বালিকারাও বড়দের পিছে ছিল না। তারা দফ বাজাতে বাজাতে নিম্নের গীতি কবিতা আবৃত্তি করছে-

وَنَحْنُ جَوَارٌ مِّنْ بَنِي النَّجَارِ

-আমরা বনূ নাজার গোত্রের বালিকা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমাদের কতইনা উত্তম প্রতিবেশী, আহ! কী যে আনন্দ।

মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করার দোয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শহরে যারা প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য উত্তম হল সেখানে প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা। অঙ্গু করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা। অতঃপর খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদরের সাথে শহরে প্রবেশ করা, এবং নীচির দোয়াটি পাঠ করবেন।

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ يَرْجُعُ السَّلَامُ فَحَنِّئْنَا بِالسَّلَامِ

وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارِكْتَ رِبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رَبَّ

أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا

نَصِيرًا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ كَانَ رَهْوًا، وَنُنَزِّلُ مِنَ
الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا।

[আল্লাহম্মা আন্তাসু সালাম ওয়া মিন্কাসু সালাম ওয়া ইলায়কা ইয়ারজি উসু সালাম ফাহাইয়েনা রাক্কানা বিস্সালাম ওয়া আদ্বিলনা দা-রাসু সালাম। তাবারাক্তা রাক্কানা ওয়া তাআলায়তা এয়া যাল জালালি ওয়াল ইক্রাম। রাক্বি আদ্বিলনী মুদ্খলা সিদ্ধিওঁ ওয়া আখ্রিজনী মুখ্রাজা সিদ্ধিওঁ ওয়াজ্জ ‘আল্লী মিল্লাদুল্কা সুলতানান্নাসীরা। ওয়াকুল জা-আল হাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বা-তিলু ইন্নাকা বা-তিলা কা-না যাহক্বা। ওয়া নুনায়িলু মিনাল ক্ষেরআ-নি মা হয়া শিফাউ ওয়া রাহুমাতুল্লিল মুমিনীন্ ওয়ালা ইয়ায়ীদুয় যালেমীন ইল্লা খাসারা]

-হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়। তোমারই নিকট থেকে শান্তি আসে। শান্তি তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং জীবিত রাখ আমাদেরকে হে আমাদের রব, শান্তি সহকারেই; এবং প্রবিষ্ট করে আমাদেরকে তোমারই শান্তির ঘর। তুমি বরকতময়, হে আমাদের রব এবং তুমি উচ্চ মর্যাদাশীল হে মহত্ত্ব ও সম্মানের মালিক! হে পরওয়ারদিগার! আমাকে সত্যিকারভাবে প্রবিষ্ট কর (মদিনা শরীফে) এবং বের কর সত্যিকারভাবে (মদিনা শরীফ থেকে), তোমার নিকট থেকে নির্ধারণ করো, সাহায্যকারী বিজয়। এবং হে হাবীব! বলে দিন, ‘এসে গেছে সত্য, নিশ্চিহ্ন হয়েছে মিথ্যা, নিঃসন্দেহে, বাতিল নিশ্চিহ্ন হবারই ছিল। এবং আমি অবতীর্ণ করি কুরআন মাজীদকে যা শেফা ও রহমত ঈমানদারদের জন্য, এবং বৃদ্ধি পায়না জালিমের ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু।

মদীনা মুনাওয়ারার যিয়ারতসমূহ

যেভাবে বহু পবিত্র যিয়ারত মক্কার ভূখণকে সজ্জিত ও তাৎপর্যবহ করেছে তেমনিভাবে অনেক যিয়ারত মদীনা মুনাওয়ারার আলো ভরা ভূমিকে আরো উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করেছে। সেইগুলির আলোচনা নিম্নরূপ-

- মসজিদে নববী শরীফ : মদীনা শরীফে তাশরীফ আনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছেন তা হল মসজিদে নববী নির্মাণ। বর্তমানে যে জায়গায় মসজিদ দেখা যায় সে জায়গাটি ছিল সাহল এবং সুহাইল নামক দুই এতিম বালকের, যাদের লালন-পালনের দায়িত্বভার সাইয়েদুনা আসআদ বিন যারারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ছিল। সে জায়গাটি খেজুর

গুকানোর কাজে ব্যবহার করা হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম বালকদ্বয়কে বললেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য তোমরা জায়গাটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা খুব অনুনয় বিনয় ও আদবের সাথে আরয করল, হে মনিব! আপনি জায়গাটি আমাদের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ করুল করুন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন মণ্ডুর করলেন না। অবশ্যে জায়গাটি মূল্য আদায করে খরিদ করা হল। হ্যরত আবু বকর ছিদীক রাদিয়াল্লাহু আন্হ দশ হাজার নামায করেছেন।

রবিউল আওয়াল ১ম হিজরী মোতাবেক অক্টোবর ৬২২ ইংরেজী সনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাতে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রাণেৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামদের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কাজ করেছেন, স্বল্পে ইট বহন করেছেন এবং তাঁর মোবারক জবানে ইরশাদ করেছেন-

اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ فَارْزِحْ لِلنَّصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ ،

-হে আল্লাহ! নিচয় পরকালের বিনিময়ই প্রকৃত বিনিময়। অতএব আপনি আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে দয়া করুন।^১

একেবারে সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তার উপকরণ ছিল ইট, খেজুর গাছের ডালপালা ও কাণ্ড। কখনো বৃষ্টি হলেই ছাদ থেকে ফেঁটা ফেঁটা পানি পড়ত। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও প্রাণেৎসর্গকারী তাঁর শিষ্যগণ সেই আদ্র ও কাদামাটিতে আল্লাহর দরবারে সাজদা করতেন। অনবরত দশ বৎসর হৃষ্যের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মসজিদে নামায আদায করেছেন। পরে এই মসজিদটি ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

মসজিদে নববীর ফর্মান

অনেক হাদীসে মসজিদে নববীর ফর্মান বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী শরীফে আছে-

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ .

-আমার এই মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে হাজারো নামায আদায করার চেয়ে উত্তম।^২

^১. বুখারী : আস সহীহ, ১২/২৯৪, হাদিস : ৩৬১৬

^২. ১. বুখারী : আস সহীহ, ৪/৩৭৭, হাদিস : ১১১৬

২. মুসলিম : আস সহীহ, ৭/১৫৪, হাদিস : ২৪৭১

মিশকাত শরীফে আছে-

وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ حَسِينٌ أَلْفَ صَلَاةٍ .

-আমার এই মসজিদে এক নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমতুল্য।^১

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

فَإِنَّ أَخْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي أَخْرُ الْمَسَاجِدِ

-নিচয় আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ।^২

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ صَلَى فِيهِ أَرْبَعِينَ صَلَاةً لَا تَقُوَّتْهُ صَلَاةٌ كُتُبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ .

-যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে অনবরত চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায করে তার জন্য জাহানাম, আযাব এবং কপটতা এই তিনি বস্তু থেকে মুক্তির পরোয়ানা লিখা হবে।^৩

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ

ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার বিজয়ের পর ৭ম হিজরীতে মসজিদে নববীকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন এবং মসজিদকে আরো প্রশস্ত ও প্রসারিত করেছেন। এরপরে বিভিন্ন সময় মসজিদে নববীর সম্প্রসারণের তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. হ্যরত ওমর ইবনুল খাতাবের শাসনামলে ১৭ হিজরী।
২. হ্যরত ওসমান বিন আফফানের খেলাফতকালে ২৯-৩০ হিজরী।
৩. ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে ৮৮-৯৯ হিজরী।
৪. আকবাসীয় শাসনকর্তা মাহদীর যুগে ১৬১-১৬৫ হিজরী।
৫. সুলতান আশরফ কা-ইতাবাস্তির যুগে ৮৮৮ হিজরী।
৬. সুলতান আব্দুল মজীদ ওসমানীর রাজত্বকালে ১২৬৫ - ১২৭৭ হিজরী।
৭. বাদশাহ সাউদের রাজত্বকালে ১৩৭২ হিজরী এবং মসজিদে নবীর বর্তমান সম্প্রসারণ বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আয়িয়ের যুগে (১৪০৫-

^১. মিশকাত শরীফ

^২. মুসলিম : আস সহীহ, ৭/১৫৪, হাদিস : ২৪৭১

^৩. অফাউল অফা : ১/৭৭

১৪১২ হি.) সম্পন্ন হয়েছে। সম্প্রসারিত বর্তমান মসজিদটির আয়তন ৯৮ হাজার ৫০০ বর্গমিটার। তাছাড়া ছাদের ওপরও নামায পড়ার জন্য ৬৭ হাজার বর্গমিটার জায়গা আছে। বর্তমানে এই মসজিদে সাধারণত ৬ লক্ষ ৫০ হাজার মুসল্লী নামায আদায় করতে পারে। তবে হজুর মৌসুমে এবং রমযানের সময় মুসল্লীর সংখ্যা ১০ লক্ষ পর্যন্ত হয়ে যায়।

মসজিদে নববীর দরজাসমূহ

দক্ষিণ পার্শ্ব ব্যতীত মসজিদে নববীর বাকী তিনি পার্শ্বে জাকজমকপূর্ণ, শোভনীয় ও আকর্ষণীয় দরজা আছে। কিছু ঐতিহ্যবাহী দরজা আছে যেগুলি চেনা দরকার। তা হল পূর্ব পার্শ্বে বাবে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, বাবুন নিসা, এবং বাবে আব্দুল আয়ীয়, পশ্চিম পার্শ্বে বাবুস সালাম, বাবে আবু বকর ছিদ্বিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, বাবুর রাহমাত এবং বাবে সাউদ, উত্তর পার্শ্বে বাবে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, বাবে মজীদি এবং বাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার দোয়া

মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার পূর্বে কিছু দান-ছদকা করবেন। প্রবেশ করার সময় দরদ শরীফ পড়তে থাকবেন এবং নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবেন-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ
 لِي ذُنُوبِي وَافْتَخِ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي إِلَيْكَ الْيَوْمَ مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ
 إِلَيْكَ وَأَقْرِبْ مَنْ تَقْرَبَ إِلَيْكَ وَأَنْجِحْ مَنْ دَعَاكَ وَابْتَغِي مَرْضَاتِكَ .

[আল্লাহহ্মা সাল্লি 'আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদীওঁ ওয়া 'আলা আ-লি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম। আল্লাহহ্মাজ্ঞফিরলী যুন্নবী ওয়াক্তাহ্লী আবৃত্ত্যা-বা রাহমাতিক। আল্লাহহ্মাজ্ঞালি উয়াউমা মিন্ন আউজাহি মান তাওয়াজ্জাহা ইসায়কা ওয়া আক্তুরাবি মান তাক্তুরুবা ইলায়কা ওয়া আন্জাহি মান দাঁআ-কা ওয়াব্তাগা মারদা-তিক।]

-হে আল্লাহ! আমাদের মনিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত ও বরকতের বারিধারা বর্ণন করুন। হে আল্লাহ! আমার পাপ-কলুষ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বার খুলে দিন। হে আল্লাহ! যারা আপনার প্রতি মনোনিবেশ করে আজ আপনি আমাকে তাদের সর্বাধিক নিবিষ্ট বানিয়ে দিন। যারা আপনার সান্নিধ্য ও নৈকট্য পেতে চায় আমাকে তাদের সবার

চেয়ে নিকটে করে নিন। এবং যারা আপনার কাছে প্রার্থনা করে ও আপনার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের সবার চেয়ে অধিক আমাকে সফলতা ও কামিয়াবি দান করুন।

রিয়াজুল জান্নাত

বাবে জিবরাইল দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার সময় বাঁদিকে সামান্য দূরে রওজা মোবারক ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিস্বারের মধ্যবর্তী সামান্য জায়গা আছে তাকে রিয়াজুল জান্নাত বলা হয়। তার দৈঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ১৫ মিটার। রিয়াজুল জান্নাত অর্থ বেহেশতের বাগিচা। পুরো মসজিদে নববীই তো বরকত ও কল্যাণের আধার তবে এই বিশেষ ভূখণ্ড সেই আধারের অতি মূল্যবান অংশ। খোদ হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে রিয়াজুল জান্নাত বলে নামকরণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمِنْ بَيْنِ رِبْطَةِ مِنْ رِبَاضِ الْجَنَّةِ .

-আমার আবাস ও মিস্বারের মাঝখানের স্থান জান্নাতের একটি বাগান।^১

জান্নাতের বাগান হওয়ার অর্থ এই যে, এটা মূলত জান্নাতের একটি সজীব বাগিচা যাকে ফেরদৌসি জমি থেকে এ ধরার বুকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যেমনিভাবে হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য হাজরে আসওয়াদকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিংবা এ অর্থও হতে পারে যে, মহা প্রলয়ের দিন এটাকে বর্তমান স্থান থেকে উঠিয়ে জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তখন তার সেই গোপন সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাবে যা এখনো আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে। তার আট স্তুতি কিছু বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ বরকতের জন্য খুবই বিখ্যাত।

মসজিদে নববীর পবিত্র স্তুতসমূহ

১. সুতুনে হান্নানাহ : এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহরাব সংলগ্ন পেছন দিকে অবস্থিত। সে স্থানে খেজুরের একটি শুকনো কাও স্থাপন করা হয়েছিল যাতে ঠেক লাগিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ নছীহত করতেন। কিন্তু যখন হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মিস্বর তৈরি করা হয় এবং তাতে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোৎবা দেন তখন এই কাও হ্যুরের বিছেদ বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে এবং কাঁদতে শুরু করে। হ্যুর সাল্লাল্লাহু

^১. ১. বুখারী : আস সহীহ, ৪/৩৮৫, হাদীস : ১১২০

২. মুসলিম : আস সহীহ, ৭/১৪৪, হাদীস : ২৪৬৩

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বর থেকে নেমে এসে তার গায়ে স্লেহের হাত বুলালেন, তখন সে শান্ত হয় এবং ক্রন্দন বন্ধ করে।

২. সুতুনে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) : এটা সুতুনে কুরআ নামেও পরিচিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করেন এই স্তম্ভের পাশে এক টুকরো এমন জমি আছে যার কথা আমি প্রকাশ করে দিলে (লোকজন এমনভাবে ভীড় জমাবে যে) সেখানে নামায আদায় করার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করতে হবে। কেউ কেউ বলেন যে, সে জায়গাটি কোথায় হ্যরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে জানা ছিল এবং তিনি তাঁর ভাগিনা হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন তাঁকে দেখলেন তারা স্তম্ভের থেকে ডানদিকে সামান্য দূরে এসেছে নামায আদায় করতেন।

৩. সুতুনে আবু লুবাবা : তার অপর নাম সুতুনে তাওবা (তাওবার স্তম্ভ)। সুতুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাম দিকে অবস্থিত। একজন বুর্যর্গ সাহাবী হ্যরত আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কোন পদস্থলন কিংবা ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নিজেকে উক্ত স্তম্ভের সাথে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অতঃপর শপথ করে ছিলেন যে, আমি আবদ্ধই থাকব যতক্ষণ না হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মোবারক হাতে আমাকে খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ত্রুটি মাফ করে ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাশরীফ এনে তাঁকে খুলে দিলেন।

৪. সুতুনে সারীর : যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করতেন তখন সে স্থানে সরীর বসাতেন। সরীর অর্থ চৌকি।

৫. সুতুনে হারস : হারস অর্থ : পাহারা, পর্যবেক্ষণ কিংবা সংরক্ষণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হেফায়ত করার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম সে স্থলে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফায়তের জন্য পাহারা দিতেন। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন বিধায় এটাকে সুতুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও বলা হয়।

৬. সুতুনে উফুদ : এটা সেই স্থান যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহিরাগত প্রতিনিধি দলের সাথে সান্ধান করতেন এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন।

৭. সুতুনে তাহাজ্জুদ : অত্র স্থানে দাঁড়িয়ে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। ছফফার সরাসরি সামনে কেবলার দিকে এ জায়গাটি অবস্থিত।

মেহরাব ও মিস্বর

রিয়াজুল জান্নাতে তুর্কিদের তৈরী একটি মেহরাব আছে। তাতে মিহরাবুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখা আছে। সেই মেহরাব সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি করতেন, কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। সেই মেহরাবের ডান পাশৰ্স্ত স্তম্ভে খচিত আছে-

هَذَا مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ

—এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের স্থান।

প্রকৃতপক্ষে সেখানে দাঁড়িয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি করতেন। রিয়াজুল জান্নাতের ডান পাশ্বে মিস্বর আছে। সেটিও তুর্কিদের হাতে তৈরী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে স্থানে হ্যুরের মিস্বর ছিল ঠিক সেই স্থানেই মিস্বরটি তৈরী করা হয়। মিস্বরের সামনে উঁচু আয়ানখানা আছে যেখানে দাঁড়িয়ে আয়ান দেয়া হয় এবং তাকবীর বলা হয়। ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, এটা সেই স্থান যেখানে খুৎবার সময় হ্যরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আয়ান দিতেন।

পবিত্র রওজা

মসজিদে নববীর নির্মাণকার্য শেষ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক নয়টি হজরা নির্মান করেছেন। হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কক্ষ ছিল মসজিদ সংলগ্ন। ওফাতের পরও হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই চির সুখের নির্দায় শায়িত আছেন এবং এটাই রওজা মোবারক নামে খ্যাত। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক পশ্চিম দিকে। পদযুগল পূর্বদিকে এবং নূরানী চেহারা কেবলামুখী দক্ষিণ দিকে করে রাখা হয়। হিজরী ১৩ সনে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহার সঙ্গী হ্যরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল

করেন তাঁকে হ্যুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই দাফন করা হয়; কিন্তু তাঁর মাথা রাখা হয় হ্যুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষের বরাবরে।

২৩ হিজরীতে যখন তাঁর অন্যতম প্রেমিক ও দ্বিতীয় খলীফা হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতের শরাব পান করেন হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিশেষ অনুমতিক্রমে তাঁকেও হ্যুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হ্যরত ছিদ্দীকে আকবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর মাথা রাখা হয় হ্যরত ছিদ্দীকে আকবরের বক্ষের বরাবরে। সেখানে আরেকটি কবর সম্পরিমাণ জায়গা এখনো খালি আছে যা রাখা হয়েছে হ্যরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য। তিনি যখন দুনিয়াতে অবতরণ করবেন অতঃপর ইহকালীন বাকী যিন্দেগী সমাপ্ত করে মহান রবের আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর সন্নিধানে চলে যাবেন তখন তাঁকে সেই খালি স্থানে দাফন করা হবে।

সবুজ গম্বুজ

রওজা মোবারকের উপর একটি সবুজ গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি তার উপর দৃষ্টি পড়ে তবে ব্যাকুল হৃদয়ে ও অঙ্গে নয়নে শান্তনা মেলে। প্রত্যেক আশেকে রাসূলের অন্তরে রয়েছে সেই সবুজ গম্বুজ যিয়ারতের শত তামানা ও ইচ্ছা আকাঞ্চ্ছা। সর্পথম বাদশাহ আল মনসুর কালদুন এটি তৈরী করেন। এটা ছিল কাষ্টফলক ও সীসার প্লেট দ্বারা তৈরী। ৮৮৮ হিজরীতে কা-ইতাবাসি বাদশাহ নূরানী রওজায় খুব সুন্দর ও চমৎকার জালি তৈরী করে দেন। ৯৮০ হিজরীতে বাদশাহ (দ্বিতীয়) সলিম নূরানী রওজায় এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় গম্বুজ নির্মাণ করেন যা দেখলে অন্তরে ঈর্ষা জাগাই স্বাভাবিক। ১২৩৩ হিজরী সনে সুলতান মাহমুদ বিন আব্দুল হামিদ ওসমানি গম্বুজটি নবরূপে নির্মাণ করেন। প্রথমে গম্বুজের রঙ ছিল সাদা, কিন্তু ১২৫৫ হিজরী সনে তাতে অতিশয় সবুজ রঙ করা হয়। গম্বুজের বর্তমান রঙ তুর্কি বাদশাহ মাহমুদ বিন আব্দুল হামিদেরই স্মৃতি ও স্মারক।

মুওয়াজাহা শরীফ ও মাকচুরাহ শরীফ

রওজা মোবারকের চারিদিকে তামা ও পিতলের জাফরি লাগানো আছে। অন্যান্য পার্শ্ব রূপ্ত্ব রাখার জন্য রয়েছে জাফরি বিশিষ্ট লোহার দরোজা। মাজার তিনটির সামনে মুওয়াজাহা শরীফের দিকে প্রায় ৬/৭ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার ছিদ্র আছে। এবং একটি প্রবেশদ্বারও আছে যা অন্যান্য প্রবেশদ্বারের মত সর্বদা বন্ধ থাকে। এই পুরো অট্টালিকাকে মাকচুরাহ শরীফ বলে।

সুফফাবাসীদের চতুর

মাকচুরাহ শরীফের উত্তর পার্শ্বে সাধারণ জমি থেকে ২ ফুট উচু একটি চতুর আছে, দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট এবং প্রস্থে ৪০ ফুট অনাথ অসহায় ও দরিদ্র সাহাবায়ে কেরাম সেখানে থাকতেন। যাঁদের না ছিল কোন ঘর এবং না কোন বাড়ী। দিবারাত্রি তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং জিকিরে নিমগ্ন থাকতেন এবং রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবত ও সাহচর্য দ্বারা উপকৃত হতেন। চতুরের তিন পাশে উন্নতমানের ও চমৎকার জালি আছে। হারাম শরীফের খাদেমগণ তার সামনে উপবিষ্ট থাকে এবং তারা মাকচুরাহ শরীফের জাফারির ভিতরে চুকে সেখানে পরিষ্কার ও ছাফাই করে। যারা যিয়ারত করতে আসে তারা সেখানে কুরআন তেলাওয়াত করে এবং নামায পড়ে। যদি আপনারও সময়-সুযোগ হয় তাহলে সেখানে নফল নামায আদায় করবেন, কুরআন তেলাওয়াত করবেন, দুর্জন শরীফ পাঠ করবেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিতি

মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে গমন করার আদবসমূহ :

মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে গমনের কিছু আদব কায়দা রয়েছে যার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী। তা নিম্নে আলোকপাত করা হল।

১. কেবল যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই গমন করবেন এবং সফর চলাকালীন জিকির করতে থাকবেন ও দুর্জন পাঠে নিমগ্ন থাকবেন।

২. যখন পবিত্র মদীনার অঙ্গন দৃষ্টিগোচর হবে তখন মাথা নত করে অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে হাজির হবেন। সম্ভব হলে নগ্ন পায়ে হাটবেন এবং যখন মদীনায় গিয়ে পৌছবেন তখন প্রিয় নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপ-সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে যাবেন।

৩. যখন সবুজ গম্বুজ নজর পড়বে তখন খুব বেশি পরিমাণে দুর্জন ও সালাম পাঠ করবেন।

৪. যে সব প্রয়োজন একাগ্রতা বিনষ্ট করে মসজিদে নববীতে হাজির হওয়ার পূর্বে শীঘ্ৰই তা থেকে ফারেগ হয়ে গোসল কিংবা অযু মিসওয়াক করে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধান করবেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেন।

৫. অতঃপর অনতিবিলম্বে অতি বিনয় ও বিন্মুতার সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা অভিযুক্তে রওয়ানা হবেন। মসজিদের দ্বারে পৌছে সালাত ও সালাম পেশ করার পর অল্পক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করবেন যেন আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

৬. বিনয়ের সাথে বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবেন। চোখ, কান, হাত, পা জবান ও দিল-দেমাগকে অন্য সব চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত রাখবেন এবং কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক-প্রেম নিয়েই সামনে এগবেন।

৭. মসজিদে কখনো উচ্চস্বরে কোন কথা বলবেন না। এটা হ্যুরের দরবারের আদবের খেলাফ।

৮. একথা পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো সশরীরে সত্যিই জীবিত আছেন, যেমনিভাবে ওফাতের পূর্বে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আব্দিয়ায়ে কেরামকে যে ওফাত দান করেছেন তা খোদারী অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং তাও এক মুহূর্তের জন্য। লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়াই তাঁদের ইন্দেকাল।

৯. অতঃপর যদি জামাত কায়েম হয় তাতে শরীক হয়ে যাবেন। এতে করে তাহীয়াতুল মসজিদও আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আগ্রহ যদি অধীর হয় আর মাকরহ সময় না হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহরাবে বা যেখানেই সুযোগ হয় দুই রাকাত তাহীয়াতুল মসজিদ এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত হতে পারার শুকরিয়া স্বরূপ আদায় করবেন।

১০. হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভক্তি শ্রদ্ধায় নিমজ্জিত অবস্থায় মুওয়াজাহা শরীফে গমন করবেন। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদার দৃষ্টি আপনার প্রতি পড়বে যা ইহকালীন সৌভাগ্য ও পরকালীন কামিয়াবির জন্য যথেষ্ট।

১১. অতঃপর জালি থেকে কমপক্ষে চার হাত দূরে কেবলাকে পশ্চাতে এবং রওজা মোবারককে সম্মুখে করে নামায়ের আকৃতিতে হাত বেঁধে অতিশয় আদরের সাথে দাঁড়াবেন এবং অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে মৃদুস্বরে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সালামের হাদিয়া পেশ করবেন। যথাসাধ্য সালাত ও সালাম পড়তেই থাকবেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে যা আরজ করবেন

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا وَآبَائِنَا
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا حَبِيبِنَا
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا خَيْرِ خَلْقِنَا
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا شَفِيعِ الْمُذْنِينَ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا سَيِّدِ الْكَوَافِرِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا إِمَامِ الْمُتَقِّيِّينَ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِنَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ
وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِّ الْعَظِيمِ : وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا . أَشْهَدُ أَنِّي يَا
رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغْتَ الرَّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ
وَجَلَيْتَ الْظُّلْمَةَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى أَتَاكَ
الْيَقِينَ جَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّا وَعَنَّ الدِّينِ وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ .

[আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া রাসূলাল্লাহু। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া হাবীবাল্লাহু। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া নবিয়াল্লাহু। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া খায়রা খালকুল্লাহু। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া শাফিউল মুয়নিবীন। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া সাইয়্যাদাল কুওনাইন। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া ইমামাল মুস্তাকীন। আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা সাইয়িদী এয়া রাহমাতাল লিল আলামীন। ওয়া ‘আলা আলীকা ওয়া আসহাবীকা ওয়া আহলি বায়তীকা এয়া রাসূলাল্লাহু। ওয়াকুদ কুলাল লাহু]

তাআলা ফি হক্কিকাল আ'যীম। ওয়ালাউ আন্নাহম ইয়েলামু আন্ফুসাহম জাউকা ফাস্তাগফারুল্লাহ ওয়াস্তাগফারা লাহুর রসূলু সাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবারু রহীমা। আশ্হাদু আন্নাকা এয়া রাসূলুল্লাহ। কৃদ্ব বাল্লাগ্তার রিসালাতা ওয়া আদ্বায়তাল আমানাতা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাতা, ওয়া কাশাফ্তাল উম্মাতা ওয়া জালায়তায় যুলমাতা, ওয়া জা-হাদতা ফী সাবিলিল্লাহি হাক্কু জিহা-দিহী ওয়া আবাদুতা রাক্বাকা হাত্তা আতা-কাল ইয়াক্বীনু। জায়া-কাল্লাহ তাআলা 'আন্না ওয়া 'আন ওয়ালিদায়না ওয়া 'আনিল ইসলামি খাইরাল জায়া-ই-হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ মাখুলক, অপরাধীদের জন্য সুপারিশকারী, দু'জাহানের সরদার, মুগ্ধকী ও খোদাভীরুদের রাহবার, বিশ্বজনীন করুনা ও আমার মনিব আপনি, আপনার বংশধর, সহচরবৃন্দ ও পরিবার পরিজনের উপর আল্লাহর রহমতের বারিধারা ও শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার মহান শানে রাব্বুল আলামীন বলেছেন- যদি তারা গুনাহ করার পর আপনার দরবারে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আর আপনিও সুপারিশ করেন তবে তারা আল্লাহকে তাওবা করুলকারী দয়াময় হিসাবে পাবে। আমি সাক্ষ্য দিছি যে, নিচয় আপনি আল্লাহর রাসূল। খোদায়ী বিধানকে আপনি (তাঁর বান্দাদের কাছে) পরিপূর্ণরূপে পৌছিয়ে দিয়েছেন। আমানতকে যথাযথভাবে আদায় করে দিয়েছেন, উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন, (কুফরীর) অঙ্ককারকে দূরীভূজ করেছেন, (বাতিলের) অমানিশাকে অপস্ত করেছেন, রাহে খোদায় যথেষ্ট চেষ্টা-মোজাহাদা করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং জাহেরী জীবনভর আপনার রবের ইবাদত করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের মাতা-পিতা ও ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুণ।

১২. হ্যুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজের জন্য এবং মাতা-পিতা, মুরুবী, শিক্ষক, সন্তান-সন্তি, প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বন্ধব ও সকল মুসলমানদের জন্য সুপারিশের প্রার্থনা করবেন এবং বারংবার আরজ করবেন যে,

أَسْتَلُكَ الشَّفَاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ

[আসু আলুকাশ শাফা'আতা ইয়া রাসূলুল্লাহ]

-আমি আপনার শাফায়াত প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহর রাসূল।

কেউ যদি হ্যুর সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহী দরবারে সালাম পৌছানোর জন্য বলে থাকে শরীয়তের হকুম মতে তা পৌছানো আবশ্যিক এবং এভাবে আরজ করবেন,

السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان

[আসু সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ মিন ফুলানিবনি ফুলান]

-হে রাসূল! অমুকের ছেলে অমুকের পক্ষে আপনার প্রতি সালাম। (নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করবেন)

১৩. অতঃপর সামান্য ডান কিংবা পূর্বদিকে সরে গিয়ে হ্যরত ছিদীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নূরানী চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবেন।

সাইয়েদুনা ছিদীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে যা আরজ করবেন

السلام عليك يا سيدنا أبي بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله على التحقيق، السلام عليك يا صاحب رحمة ثانية إذ همبا في الغار، السلام عليك يا من أنفق ماله كله في حب الله وحب رسوله حتى تحمل بالعباء رضي الله تعالى عنك وأرضاك أحسن الرضا وجعل الجنة منزلك ومسنك تحمل وماواك السلام عليك يا أول الخلفاء ورحمة الله وبركاته.

[আসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদুনা আবা বাকরিনিস সিদীক। আস সালামু আলাইকা ইয়া খলিফাতা রাসূলুল্লাহি আলাভাহাক্বীকু। আস সালামু আলাইকা ইয়া সা-হিবা রাসূলুল্লাহি সা-নিয়াস নায়নি ইয হুমা ফির গা-র। আস সালামু আলাইকা ইয়া মান আনফাকা মালাহ কুল্লাহ ফী ছবিল্লাহি ওয়া হুবি রাসূলিহি হাত্তা তাখাল্লালা বিল 'আবা। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকা ওয়া আবদা-কা আহসানার রিদা ওয়া জা'আলাল জান্নাতা মানফিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহল্লাকা ওয়া মা'ওয়াকা। আস সালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালাল খোলাফা-ই ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।]

-হে আমাদের সরদার আবু বকর ছিদীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রাসূলের সত্য ও প্রকৃত প্রতিনিধি আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর, পবর্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী (রাহে খোদার)

আত্মাংসগকারী দু'জনের একজন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে মহা দানবীর, আপনি একটি জুবু ছাড়া আপনার সব সম্পদ - ঐশ্বর্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসায় ব্যয় করেছেন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহতাআলা আপনার উপর সন্তুষ্ট হোক এবং আপনাকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট রাখুন। জান্নাতকে আপনার জন্য অবতরণস্থল, আবাসস্থল ও ঠিকানা বানিয়ে দিন। হে সর্বপ্রথম খলীফা, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমতের বারিধারা ও বরকত নায়িল হোক।

১৪. অতঃপর আবারো সে পরিমাণ সরে হ্যরত ফারুকে আয়ম রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবেন।

হ্যরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে যা আরজ করবেন

السلامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ
، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَفِيْهِ الْمُحْرَابِ ، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهِرِ دِينِ الإِسْلَامِ ،
الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرِ الْأَضْنَامِ ، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْفُقَرَاءِ وَالضُّعِيفَاءِ
وَالْأَرَاملِ وَالآيتَامِ أَنْتَ الَّذِي قَالَ فِي حَقْكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ لَوْ كَانَ نَبِيًّا مِنْ بَعْدِي
لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ أَخْسَنُ الرَّضَاءِ وَجَعَلَ
الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكِنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوَاكَ ، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَانِي الْخُلُفَاءِ وَرَحْمَةُ
الله وَبَرَكَاتُه.

[আস সালামু আলাইকা ইয়া ওমারুবনাল খান্তাব! আস সালামু আলাইকা ইয়া না-তিকান বিল 'আদলি ওয়াস সাওয়াব। আস সালামু আলাইকা ইয়া হাফিয়্যাল মিহরাব! আস সালামু আলাইকা ইয়া মুয়হিরা দীনিল ইসলাম। আস সালামু আলাইকা ইয়া মুকাসসিরাল আসনাম। আস সালামু আলাইকা ইয়া আবাল ফুকুরা-ই ওয়াদ দো'আফা-ই ওয়াল আরামিলি ওয়াল আয়তাম। আনতাল্লায়ী কু-লা কী হাকুক্কি সাইয়েদুল বশরং 'লাউ কা-না নাবিয়ুম মিমবা'দী লাকা-না ওমারাবনাল খান্তাব।' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকা ওয়া আরদাকা আহসানার রিদা। ওয়া জা'আলাল জান্নাতা মানযিলাকা ওয়া মাসকানাকা ওয়া মাহাল্লাকা ওয়া মা'ওয়াকা। আস সালামু আলাইকা ইয়া সানিয়াল খোলাফা-ই ওয়া রাহমতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহ।]

-হে ওমর ইবনুল খান্তাব! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে সত্য-ন্যায়ের কর্তৃপ্রকার, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে অধিক পরিমাণে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিত্ব, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে ইসলাম ধর্মের বিজয়ের হোতা! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে প্রতিমার গায়ে আঘাতকারী আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে অনাথ, অসহায়, বিধবা ও এতিমদের অভিভাবক, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব আপনার শানেই তো বলেছেন, আমার পরে যদি কোন নবী হওয়ার সম্ভবনা থাকত তাহলে ওমর ইবনুল খান্তাবই নবী হত। আল্লাহ আপনার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট রাখুন এবং জান্নাতকে আপনার জন্য অবতরণস্থল, আবাসস্থল ও স্থায়ী ঠিকানা বানিয়ে দিন। হে দ্বিতীয় খলীফা! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমতের বারিধারা ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

১৫. এরপরে এক বিঘত পরিমাণ পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তন করে উভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করবেন।

السلامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيرِيْ رَسُولِ اللهِ ، الْسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا مُعِينِيْ رَسُولِ اللهِ ،
الْسَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

আস সালামু আলাইকুমা ইয়া ওয়াফি-রায় রাসুলিল্লাহি। আস সালামু আলাইকুমা ইয়া মু'ঈনায় রাসুলিল্লাহি। আস সালামু আলাইকুমা ওয়ারাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

-আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহকারীদ্বয়, আপনাদের উপর শান্তি, রহমত ও বরকত নায়িল হোক।

অতঃপর নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবেন-

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَجَاءَ السَّائِلِينَ وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ وَحِرْزَ الْمُتَوَكِّلِينَ
يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ يَا دَيَانُ يَا سُلْطَانُ يَا سُبْحَانُ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ
إِسْمَعْ دُعَائِنَا وَتَقْبِلْ زِيَارَتَنَا وَأَمِنْ حَوْفَنَا وَاسْتَرْ عُبُوبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَارْحَمْ

أَمْوَاتَنَا وَتَقْبِيلٌ حَسَنَاتِنَا وَكَفَرْ سَيِّئَاتِنَا وَاجْعَلْنَا يَا اللَّهُ عِنْدَكَ مِنَ الْغَائِيْزِينَ
الْفَائِيْزِينَ الشَّاكِرِينَ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

আল্লাহমা এয়া রক্ষাল আলামীন। এয়া রাজা-আসু সা-ইলীন। ওয়া আমানাল খা-ইফীন। ওয়া হিরিয়াল মুতাওয়াক্কিলীন। এয়া হান্নানু, এয়া মান্নানু, এয়া দাইয়্যানু, এয়া সুলতানু, এয়া সুবহানু, এয়া কুদী-মাল ইহসান। এয়া সা-মি'আ দো'আ ইসুমা দো'আ আনা, ওয়া তাক্তাক্ষাল যিয়ারাতানা ওয়া আ-মিন্ খাউফানা ওয়াস্তুর 'উয়ুবানা ওয়াগফির যুনুবানা ওয়ারহাম আমওয়া-তানা ওয়া তাক্তাক্ষাল হাসানা-তিনা ওয়া কাফ্ফির সাইয়িয়া-তিনা ওয়াজ্জ'আলনা এয়া আল্লাহ ইন্দাকা মিনাল 'আ-ইয়ীনাল ফা-ইয়ীনাশু শা-করীনা মিনাল্লাযীনা লা-খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানুন। বিরাহমাতিকা এয়া আরহামার রাহিমীন এয়া রাক্ষাল আলামীন।

-হে আল্লাহ, হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, ভিথারীদের আশা পূরণকারী, ভীত সন্তুষ্টদেরকে নিরাপত্তাদানকারী, ভরসাকারীদেরকে আশ্রয়দানকারী। হে দয়ার্দ, হে উদার, হে মহা দানবীর, হে শাহেনশাহ, হে পাক পবিত্র সত্তা, হে সর্বক্ষণ অনুগ্রহদানকারী বিধাতা এবং হে প্রার্থনা শ্রবণকারী! আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, আমাদের যিয়ারত করুল করুন, ভয়-ভীতি দূর করুন, দোষ ক্রটি গোপন রাখুন, পাপ-পক্ষিলতা মাফ করুন, এবং আমাদের মৃতদেরকে দয়া করুন, নেক আমলকে করুল করুন, বদ-আমলকে ক্ষমা করুন এবং হে আল্লাহ, সারা জাহানের প্রতিপালক এবং সর্বাধিক করুণাময় রব, আপন করুনায় আমাদেরকে সেই সৌভাগ্যশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার আশ্রয় পেয়েছে, সফল হয়েছে, আপনার শোকের আদায় করে এবং যাদের নেই কোন ভয়-ভীতি ও দুঃখ বিমর্শতা।

দ্বিতীয় দোয়া

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا الشَّرِيفِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ذَبْنَابِ إِلَّا عَفْرَةَ وَلَا هَمَّا يَا
اللهُ إِلَّا فَرَجَّهَ وَلَا عَيْنَابِ يَا اللهُ إِلَّا سَرَّهَ وَلَا مَرِبْضَابِ يَا اللهُ إِلَّا شَبَيْهَ وَعَافَيْهَ وَلَا مُسَافِرًا
يَا اللهُ إِلَّا نَجَّيْهَ وَلَا غَائِبًا يَا اللهُ إِلَّا رَدَّهَ وَلَا عَدُوًا يَا اللهُ إِلَّا خَذَلَهَ وَدَمَرَهَ وَلَا فَقِيرًا يَا

اللهُ إِلَّا أَغْنَيْهَ وَلَا حَاجَةَ يَا اللهُ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَنَا فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا
وَيَسِّرْهَا اللَّهُمَّ افْصِحْ حَوَائِجَنَا وَيَسِّرْ أُمُورَنَا وَاسْرَخْ صُدُورَنَا وَتَقْبِيلَ زِيَارَتَنَا وَآمِنْ
خَوْفَنَا وَاسْتَرْعِيْغُوبَنَا وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَاکْشِفْ كُرُوبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا وَرُدِّ
غُرْبَتَنَا إِلَى أَهْلَنَا وَأَوْلَادِنَا سَالِمِينَ غَانِمِينَ مَسْتُورِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ
الَّذِيْنَ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

আল্লাহমা লা তাদা'লানা ফী মাক্কামিনা হা-যাশ্ শরীফি ফি মাসজিদি
রাসূলিল্লাহি, যামবান্ ইল্লা গাফারতাহ, ওয়ালা হাম্মান ইয়া আল্লাহ ইল্লা-
ফাররাজতাহ, ওয়ালা 'আইবান ইয়া আল্লাহ ইল্লা সাতারতাহ ওয়ালা মারীদান
ইয়া আল্লাহ ইল্লা শাফায়তাহ, ওয়া 'আ-ফায়তাহ ওয়ালা মুসাফিরান ইয়া
আল্লাহ ইল্লা নাজ্জায়তাহ ওয়ালা গা-ইবান ইয়া আল্লাহ ইল্লা রাদাদতাহ ওয়ালা
'আদুওভান ইয়া আল্লাহ ইল্লা খাযালতাহ ওয়া দাম্মারতাহ, ওয়ালা ফাকুরান
ইয়া আল্লাহ ইল্লা আগনায়তাহ, ওয়ালা হা-জাতান ইয়া আল্লাহ মিন হাওয়া-
ইজিদুনিয়া ওয়াল আ-খিরাতি লানা ফিহা সালাহন ইল্লা ক্ষাদায়তাহা ওয়া
ইয়াসসারতাহা। আল্লাহম্বকুদি হাওয়া-ইজানা ওয়া ইয়াসসির উম্রানা
ওয়াশরাহ সুদুরানা ওয়া তাক্তাক্ষাল যিয়ারাতানা ওয়া আ-মিন খাউফানা
ওয়াস্তুর 'উয়ুবানা ওয়াগফির যুনুবানা' ওয়াকশিফ কুরবানা ওয়াখতিম বিস
সালিহা-তি আ'মা-লানা ওয়া কুদ্দা শুরবাতানা ইলা আহলিনা ওয়া আওলা-দিনা
সা-লিমীনা গানিমীনা, মাস্তুরীনা ওয়াজ্জালনা মিন ইবাদিকাসু সালিহীনা
মিনাল লাযীনা লা খাওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানুন। বিরাহমাতিকা
ইয়া আরহামার রাহিমীন। ইয়া রাক্ষাল আলামীন।

-হে আল্লাহ, এই সম্মানিত স্থানে তথা মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) মসজিদে আমাদের সকল পাপ-পক্ষিলতা ক্ষমা করে দিন,
সকল দুঃখ-দুর্দশা মুছে দিন, সকল দোষ - ক্রটি গোপন রাখুন, সকল
রোগীদেরকে আরোগ্য ও সুস্থান্ত্র দান করুন, সকল মুসাফিরকে সফরের
কষ্ট ক্রেশ থেকে নিছুতি দিন, সকল পথহারাকে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে
দিন। সকল শক্রকে লাপ্তিত ও ধ্বংস করুন। সকল বিড়হীনকে বিন্ত-
ঐশ্বর্য দান করুন। হে আল্লাহ! ইহজগত ও পরজগতের যে সব
প্রয়োজনে আমাদের কল্যাণ নিহিত আছে আপনি সবগুলি পূরণ করে দিন
ও সহজ করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের প্রয়োজননাদি পূরণ করে দিন,
সকল কাজ কর্ম সহজ করে দিন। অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন, যিয়ারতকে

কবুল করুন, ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন, দোষ-ক্রটিকে গোপন রাখুন, পাপ-পক্ষিলতা মাফ করে দিন, কষ্ট ক্লেশ দূর করে দিন, নেক আমল দ্বারা আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করুন। শান্তি নিরাপত্তা ও সফলতার সাথে অন্যায় অপরাধ নিঃত্বে রেখে আমাদেরকে সফর-জীবন থেকে পরিবার পরিজনের কাছে পৌছিয়ে দিন। আমাদেরকে আপনার সৎবান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যদের নেই কোন ভয় আশঙ্কা ও দুঃখ বিমর্শ। হে বিশ্বাসীর রব। হে সর্বাধিক করুনাময়, এটা এসব কেবল আপনারই করুনায়।

১৬. অতঃপর যদি মাকরুহ সময় না হয় তাহলে পবিত্র মিস্বরের পাশে কিংবা রিয়াজুল জান্মাতে দুই রাকাত নফল পড়ে দোয়া করবেন।

১৭. যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনা তাইয়েবায় থাকার সুযোগ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি মুহূর্তও যেন অবহেলায় কেটে না যায়। প্রয়োজনাদি ব্যতীত অধিকাংশ সময় পবিত্রতার সাথে মসজিদে অতিবাহিত করবেন। নামায তেলাওয়াত এবং দরদ পাঠে মশগুল থাকবেন। শিষ্টাচারবিরোধী কোন আলোচনা করবেন না। যে কোন মসজিদে যাওয়ার সময় সর্বদা ইতিকাফের নিয়ত করবেন।

১৮. এখানে একটি নেকীর পরিবর্তে পঞ্চশ হাজার নেকী লেখা হয় তাই বেশী পরিমাণে ইবাদত করার চেষ্টা করবেন এবং আহার পানাহার একটু হাস করবেন। মদীনার পবিত্র জমিতে যদি রোয়া রাখা নষ্টীব হয় তবে এটা কত যে মহান সৌভাগ্যের বিষয় এবং এর জন্য রয়েছে পরকালীন সুপারিশের ওয়াদা।

১৯. রওজা মোবারকের প্রতি তাকানো ইবাদত। তাই সেদিকে খুব বেশি পরিমাণে তাকাবেন এবং সেই পবিত্র শহরের অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে যেখানেই সবুজ গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হবে তৎক্ষণাত্ম হাত বেঁধে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত ও সালাম পেশ করবেন। কখনো এর ব্যতিক্রম করবেন না। কেননা তা আদবের পরিপন্থী।

২০. এখানে এবং কাবার হাতীমে কমপক্ষে একবার কুরআন মাজীদ খতম করা উচিত।

২১. দৈনিক পাঁচবার বা কমপক্ষে সকাল -সন্ধ্যা সালাম পেশ করার জন্য মুওয়াজাহা শরীফে আসবেন।

২২. ওয়র ব্যতিরেকে নামায না পড়া সব জায়গায় গোনাহ। আর যদি কয়েকবার হয় তাহলে এটা জঘন্য হারাম ও মহা পাপ। আর পবিত্র মদীনায় এমনটি করা তো নিঃসন্দেহে গোনাহ। তা ছাড়া বড় ধরনের বঞ্চনাও বটে। (নাউয়ুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে অনবরত চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে তার জন্য দোষখ ও কপটতা থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। স্মর্তব্য যে, সর্বক্ষণ নবীজীর প্রতি অন্তরে পরম ভক্তি ও শুদ্ধা থাকা জরুরি।

২৩. রওজা মোবারক যেন কখনো পিঠ পিছনে না হয় এবং যথাসাধ্য নামাযে ও এমন স্থানে দাঁড়াবেন যাতে করে রওজা মোবারক পশ্চাতে না পড়ে।

২৪. রওজা মোবারকের তাওয়াফ করবেন না এবং সিজদাও করবেন না এবং এ পরিমাণ ঝুকবেনা না যাতে রূপুর অনুরূপ হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ করাই হ্যুরের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন।

২৫. প্রস্থানের সময় নূরানী রওজায় হাজির হবেন এবং মুওয়াজাহা শরীফে দিয়ে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বারংবার এই নেয়ামত লাভের প্রার্থনা করবেন। প্রস্থানকালের সকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং খাঁটি মনে দোয়া করবেন যে, হে রব! নিষ্কলুষ দীমান নিয়ে পরিপূর্ণ সুন্মাতের উপর মদীনার এই পবিত্র জমিনে শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করার সৌভাগ্য যেন আমায় লাভ হয় এবং জান্মাতুল বাকী যেন হয় আমার সমাধিস্থল। নবীকুলের সরদারের উসিলায় এই প্রার্থনা মণ্ডুর করুন।

জান্মাতুল বাকী

এটা মদীনা মুনাওয়ারাহর বড় গোরস্থান। মসজিদে নবীর পূর্বদিকে অবস্থিত। বাবে জিবরাইল দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে কেউ যদি সড়কে আসে তো জান্মাতুল বাকীর সীমান্ত নজরে পড়ে। এক বর্ণনা মতে, সেখানে দশ হাজার সাহাবী শায়িত আছেন। তাছাড়া অসংখ্য তাবেন্দেন, তাবে-তাবেন্দেন, আলিম এবং আরো অন্যান্য ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন।

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হ্যরত উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ব কোণে শায়িত আছেন। উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর সেখানে অবস্থিত। উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত খদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হ্যরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত অন্য সব উম্মুল মু'মিনীন এবং হ্যুরের প্রিয় কন্যাত্রয় তথা হ্যরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু

আনহা, হযরত রহকেয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং আদরের পৃত্র হযরত ইব্রাহীম সেই সম্মানিত স্থানে শুরো আছেন। তাছাড়া হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আকীল বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হালীমা সা'দিয়া এবং হৃষ্ণের ফুফীগণের মাজারও জান্নাতুল বাকীর চতুর্বেষ্টনীর ভিতরে। জান্নাতুল বাকীর পূর্ব দেয়ালের বাইরে হযরত আবু সাউদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রদেয় মাতা হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহার মাজার বিদ্যমান।

হযরত উসমান বিন মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত সাদ বিন আবু ওয়াক্তাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত খুনাইস বিন ত্ব্যাফা রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আসাদ বিন যায়ারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের মাজারও সেখানে বিদ্যমান। শায়খুল কুররা ইমাম নাফে^১ এবং ইমাম মালেকও সেখানে সমাহিত হয়েছে। যে সকল সাহাবায়ে কেরাম উভদ যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মদীনায় পৌছে ওফাত বরণ করেছেন তাঁদের সমাধিও চতুর্বেষ্টনীর ভিতরে। অধিকাংশ সময় হৃষ্ণের সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম জান্নাতুল বাকীতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানে শায়িত কবরবাসীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতেন।

মসজিদে নববী এবং রওজা মোবারকের পর সর্বপ্রথম জান্নাতুল বাকীর যিয়ারত করা উচিত। সেখানে উপস্থিত হয়ে সর্বাঞ্চ হযরত উসমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজারে সালাম পেশ করবেন। কেননা বাকীবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। কেউ সর্বপ্রথমে হযরত ইবরাহীমের মাজারে আবার কেউ হযরত আব্বাসের মাজারে সালাম পেশ করে।

জান্নাতুল বাকীর দোয়া

জান্নাতুল বাকীতে হাজির হয়ে নিম্নরূপ দোয়া করবেন-

أَسْلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ يَا أَهْلَ الْجَنَابِ الرَّفِيعِ أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحْنُ
 إِنْسَاءُ اللَّهِ بِكُمْ لَا حِقُونَ أَبْشِرُوا بِأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَبَّ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَعْثُ
 مَنْ فِي الْقُبُوْرِ. أَنْسَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَشَرَفُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلٍ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

[আস সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বক্সী-ই, ইয়া আহলাল জানা-বির রফী-ই, আনতুমুস সা-বিকুনা, ওয়া নাহনু ইনশাআল্লাহু বিকুম লা-হিকুন, আবশিরু বি-আন্নাস সা-আতা আ-তিয়াতুন, লা-রায়বা ফী-হা, ওয়া আন্নাল্লাহু ইয়াব'আচু মান ফিল কুবু-রি। আ-নাসাকুমুল্লাহু তাআলা ওয়া শাররাফাকুমুল্লাহু তাআলা বি-ক্লাউলি আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহ]

-হে বাকীবাসী, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মহান দরবারের লোকেরা আপনারা চলে গেছেন আমাদেরকে রেখে গেছেন, ইনশাআল্লাহু আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হব। আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুণ যে, কেয়ামত অবশ্যত্বাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয় আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনরুঞ্চিত করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বানিয়ে নিন এবং আপনাদেরকে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করুণ একথার কারণে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি, যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।

মসজিদে কুবা

মসজিদে নববী থেকে প্রায় আড়াই মাইল দূরে মদীনা মুনাওয়ারাহর দক্ষিণে অবস্থিত। এটা ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, এবং বাযতুল মাকদাস এই তিনি মসজিদের পর অত্র মসজিদ ভূ-পৃষ্ঠের সকল মসজিদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ। এর প্রশংসায় খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআনে মজীদে ইরশাদ করেছেন-

لَمَسْجِدٌ أَبْسَسَ عَلَى الْتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

-তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান।^১

হৃষ্ণের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন পবিত্র মক্কা নগরী থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ এনেছিলেন তখন বনু আমর বিন আউফ গোত্রের এলাকায় অবস্থান করেছিলেন এবং সে স্থানে হযরত মাকতুম রাদিয়াল্লাহু আনহুর জমিতে নিজ হাতে পাথর স্থাপন করে মসজিদে কোবা নির্মাণ করেছিলেন।

^১. আল-কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৮

অধিকাংশ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ قُبَّاً كَعُمْرَةٍ.

-মসজিদে কোবায় নামায আদায় করা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) ওমরার
সমতুল্য।

মসজিদের বর্তমান ভবন তুর্কিদের গড়া। সউদী সরকার তার অনেক মেরামত ও সংস্কার করেছে। মেরামত ও সংস্কার সাধনের পর মসজিদটি অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মসজিদে কিবলাতাইন

মদীনা মুনাওয়ারাহর উত্তর পশ্চিমে প্রায় তিন মাইলের দূরত্বে আকীক উপত্যকায় এই মসজিদটি অবস্থিত। এস্থান থেকে মদীনা ইউনিভার্সিটির ভবন একেবারে সামনে দেখা যায়। ইসলামী ইতিহাসের এক তৎপর্যবহুল ঘটনা এ মসজিদের সাথে জড়িত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর নিজ অভ্যাসানুযায়ী সতের মাস যাবৎ বায়তুল মাকদাস মুখী হয়ে নামায আদায় করেন; কিন্তু ইয়াহুদী সম্প্রদায় এ বলে ভৎসনা করল যে, মুসলমানরা তো আমাদের বিরোধিতা করে তবে নামায আমাদের কেবলামুখী হয়ে আদায় করে। তাই হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাশা ছিল যে, বায়তুল মাকদাসের পরিবর্তে বায়তুল হারাম তথা কা'বা শরীফ যদি মুসলমানদের কেবলা হত! যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যুরে জিবরাইল আলাইহিস সালামের কাছে উক্ত আশা ব্যক্ত করেন তখন তিনি আরজ করলেন, হ্যুর! আপনার প্রার্থনা তো অবশ্যই মণ্ডুর করা হয় ফেরত দেয়া হয়ন। তাই আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকুন। এরপর থেকে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন এবং প্রত্যেক নামাযের পর হ্যুরের নূরানী চেহারা উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেন এ আশায় যে, আমার রবের হ্রুম যদি এখনই আসত। একদিন হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সালামা গোত্রের মসজিদে নামায আদায় করছিলেন তখন নিম্নের আয়াতটি অবর্তীণ হয়-

قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَنَهَا فَوْلِ
وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيتَ مَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ

-নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘূরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর।^১

হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকাকালেই কা'বা শরীফের দিকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। হ্যুরের সাথে সাথে সাহাবারে কেরামও কা'বা শরীফের দিকে ফিরে গেলেন। বর্ণিত আছে যে, কেবলা পরিবর্তনের এ হ্রুম ২য় হিজরীর শাবান মাসে এই মসজিদেই অবর্তীণ হয়। তাই এটাকে মসজিদে কেবলাতাইন (দুই কেবলা বিশিষ্ট মসজিদ) বলা হয়। মসজিদটির এক দেয়ালে বায়তুল মাকদাসমুখী মেহরাবের চিহ্ন আছে এবং অপর এক দেয়ালে অন্যান্য মসজিদের ন্যায় কা'বামুখী মেহরাব নির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদে জুমা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন তখন কুবাবাসীদের বস্তিতে ১৪ দিন অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর জুমার দিন মদীনা নগরীর দিকে রওয়ানা দিলেন। এখন বনু সালেম গোত্রের এলাকায় পৌছলে নামাযের সময় হয়ে গেল। তাই হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই নামায আদায় করেছেন। নামাযের পূর্বে খৃৎবা দিয়েছিলেন। মদীনার জমিতে এটা ছিল হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জুমা। কুবার নতুন পথে পূর্ব পার্শ্বে মসজিদটি অবস্থিত। এটা মসজিদে ওয়াদী এবং মসজিদে আতিকা নামেও পরিচিত। কুবা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে উক্ত মসজিদে নফল আদায় করা মহা পুণ্যের কাজ।

মসজিদে গমামাহ

মসজিদে নবীর বাবুস্ সালামের সম্মুখে এটা একটি সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। মসজিদে মুছল্লা নামেও পরিচিত। হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে ঈদের নামায আদায় করতেন। ইস্তিস্কার নামায (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) ও আদায় করেছিলেন। একদা হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় রৌদ্রতাপ প্রথর হয়ে উঠলে তৎক্ষণাত এক টুকরো মেঘ এসে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ছায়া বিস্তার করে। তাই সে মসজিদটি মসজিদে গমামাহ বা মেঘের মসজিদ নামে খ্যাত লাভ করে। তার অদূরে হ্যুরত

আবৃ বকর ছিদ্রীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হ্যরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং শেরে খোদা হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মসজিদ আছে।

মসজিদে ফাতাহ

সিলা পর্বতের চূড়ায় পশ্চিম প্রান্তে এটা অবস্থিত। এটাকে মসজিদে আহ্যাব এবং মসজিদে আ'লাও বলা হয়। পরিখার যুদ্ধের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থলে সোম, মঙ্গল ও বুধবার তিনদিন যাবৎ দোয়া করেছিলেন। বুধবারে আল্লাহ তাআলা হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া মণ্ডুর করেছেন, বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। হ্যরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখনই আমি কোন বিপদ ও জটিলতার সম্মুখীন হই আমি সে স্থানে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তখন আল্লাহ তাআলা জটিলতাকে দূর করে দেন এবং আমাকে বিপদ থেকে উদ্বার করেন। সেই মসজিদের আশে পাশে মসজিদে সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদে আবৃ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মসজিদে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে আরো ৪টি মসজিদ আছে। সে মসজিদসমূহের জায়গায় পরিখার যুদ্ধের সময় উপর্যুক্ত বুর্যগদের ঘাটি ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে অবস্থানে তাশরীফ এনেছেন এবং নামাযও আদায় করেছেন। হ্যরত ওমর ইবনে আব্দুল আয়ীফ রাহমতুল্লাহি আলাইহি সে জায়গাসমূহে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। উক্ত স্থানটি মাসজিদে খামসা নামে খ্যাত। যদি সেই মসজিদসমূহ যিয়ারত করা আমাদের নষ্ঠীব হয় তবে যিয়ারতকালে সেই পরিখার ঐতিহাসিক দৃশ্য স্মৃতিপটে ভাসিয়ে তোলা উচিত যেটি কঠিন মুহূর্তে করুণ পরিস্থিতিতে মুসলমানগণ হ্যরত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শক্রমে খনন করেছিলেন। তাছাড়া ইসলামের ঐতিহ্যবাহী আরো বহু মসজিদ রয়েছে। যেমন- মসজিদ কবীর, মসজিদে সাম্স, মসজিদে সুকয়া, মসজিদে বনু হারাম, মসজিদে বনু কুরায়া, মসজিদে বনু যফর, মসজিদে ইবরাহীম, মসজিদুল ইজাবা, মসজিদুল ফাজীহ, মসজিদে যুবাব, মসজিদে সাজদা, মসজিদে উবাই ইত্যাদি।

উহুদ ও শহীদানে উহুদের যিয়ারত

উহুদ পবিত্র মদীনার উত্তরে তিন মাইল দূরে একটি পবিত্র পৰ্বত। যে পর্বত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি উহুদকে ভালবাসি আর উহুদ আমাকে ভালবাসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উহুদে তাশরীফ রেখেছিলেন তখন বলেছিলেন, তোমরা যখন উহুদে গমন

কর তখন উহুদের বৃক্ষ থেকে কিছু খাও, যদিও তা কাটাযুক্ত বৃক্ষ হয়। হ্যুরের সেই নির্দেশমতে উহুদের বৃক্ষ ঘাস এবং চারা ঘাস ইত্যাদি থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও খেয়ে নেয়া উচিত। বৃহস্পতিবারে উহুদের যিয়ারত করা উচ্চম।

উক্ত পাহাড়ের পাদদেশেই হিজরী তয় সনে উহুদের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যাতে নবীজীর প্রিয় পিতৃব্য হ্যরত হাময়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সন্দরজন বিখ্যাত ও বুর্যগ সাহাবী শাহাদাতের শরাব পান করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ও কোমল দেহে আঘাত লেগেছে ও তাঁর স্বর্ণেজ্জুল মোবারক দাঁত শহীদ হয়েছে। হ্যরত হাময়া রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য সব শহীদানে উহুদের মাজার নির্দিষ্ট একটি বেঠনীর ভিতরেই অবস্থিত।

হ্যরত হাময়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাজার বেঠনীর মধ্যখানে। আপনি যদি বেঠনীর দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান তাহলে সম্মুখে দেখতে পাবেন জাবালে রূমাত নামে খ্যাত সেই পাহাড়টি যেখানে হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্জশজন তীরন্দাজ সাহাবায়ে কেরামকে অনঢ়-অবিচল বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর উহুদের শহীদদের মাজারে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ। তোমাদের পরজীবন কতই না উচ্চম! নিম্নের্বর্ণিত পছায় তাঁদের খেদমতে সালাম পেশ ও দোয়া করবেন-

السلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا حَمزةُ عَمُ رَسُولِ اللهِ، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشَّهَادَاءِ،
السلامُ عَلَيْكَ يَا أَسْدُ اللهِ وَأَسْدُ رَسُولِهِ، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ جَحَشٍ
، الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَضْعِبَ بْنِ عُمَيْرٍ، الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءِ أُخْدِي، الْسَّلَامُ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ، اللَّهُمَّ أَجْزِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَآهُلِهِ
أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَأَجْزِلْ نَوَابِهِمْ وَأَكْرِمْ مَقَامَهُمْ وَارْفَعْ دَرْجَاتِهِمْ بِمَنْكَ وَكَرِمِكَ
يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ.

[আসু সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদানা হামযাতু 'আম্মু রাসূলিল্লাহি। আসু সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদাশ শোহাদা-ই। আসু সালামু আলাইকা ইয়া আসাদাল্লাহি ওয়া আসাদা রাসূলিল্লাহি। আসু সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়েদানা আবদুল্লাহিবনা জাহশিন। আসু সালামু আলাইকা ইয়া মুসআবাবনা ওমায়রিন।

আস সালামু আলাইকুম ইয়া শোহাদা-আ উহুদিন। আস সালামু আলাইকুম
বিমা সাবারতুম ফা-নি'মা উকবাদ দারে। আল্লাহমা আজযিহীম আনিল
ইসলাম ওয়া আহলিহী আফদালাল জাযায়ি ওয়া আজযিল সওয়াবাহুম ওয়া
আকরিম মকামাহুম ওয়ারফা'। দারজাতাহুম বি-মন্ডিকা ওয়া কারামিকা ইয়া
আকরামাল আকরামীন।

-সালাম আপনার প্রতি, হে আল্লাহর রসূলে সম্মানিত চাচা। সালাম
আপনার প্রতি, হে শহীদদের সরদার। সালাম আপনার প্রতি, হে
আল্লাহর সিংহ ও তাঁর রসূলের সিংহ। সালাম আপনার প্রতি, হে
আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। সালাম আপনার প্রতি, হে মুসআব ইবনে
উমাইর। সালাম আপনাদের প্রতি, হে উহুদের শহীদের। সালাম
আপনাদের প্রতি, যারা দৈর্ঘ্যধারণ করেছেন। কতই না উত্তম ঘর
আখিরাতের। হে আল্লাহ! ইসলাম ও আহলে ইসলামের পক্ষ থেকে
তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁদেরকে অশেষ সাওয়াব দান করুন,
তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁদেরকে উচ্চ স্তর দান
করুন- তোমার দয়া ও রহমতের উসিলায়। হে সর্বোক্তম দয়াবান।

পবিত্র মদীনার কৃপসমূহ

যে সব কৃপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সমন্বযুক্ত অর্থাৎ
কোন্ট্রির পানি দ্বারা হ্যার অযু করেছেন, কোন্ট্রির পানি পান করেছেন আবার
কোনটিতে পবিত্র মুখের থুথু নিক্ষেপ করেছেন। আরীস কৃপ, ঘরস কৃপ, বিজা-
আ-কৃপ, বিরে হা, জমজম কৃপ, বিরে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু
বিরে বাছাহ, ইহন কৃপ, জরআ কৃপ, জমল কৃপ, জাসুম কৃপ, রুমা কৃপ ইত্যাদি।
বর্তমানে কিছু কৃপ যদিও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কিন্তু অনেক কৃপ এখনও আপন
অবস্থায় বাকী আছে।

বিদায় হে প্রিয় নবীজীর প্রিয় শহুর, তোমাকে বিদায়!

মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে প্রস্থানের প্রাক্কালে পবিত্র মসজিদে নবীতে হাজির হয়ে
দু'রাকাত নফল নামায আদায় করবেন। অসহায় নিঃস্বজনদের আশ্রয় মহানবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হবেন। হ্যার সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের বিছেদ বেদনায় অশ্রু ঝারিয়ে ক্রন্দন করবেন। স্বীয় মাতা-পিতা,
আত্মীয়-স্বজন, বকু-বাক্স এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য নিম্নরূপ দোয়া
করবেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِجَمِيعِ أَهْلِ بَيْتِي وَأَجْبَانِي
وَلِوَالدَّيِّ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ مَغْفِرَةً لَا تُغَادِرُ ذَبَابًا وَلَذِخْلَنَا الْجَنَّةَ بِجِئْنَا
بِغَيْرِ حِسَابٍ ، اللَّهُمَّ أَعِذْنَا بِجِئْنَا مِنْ حَزَنِ الشَّيْطَانِ وَأَبْشِنَا وَأَمْتَهْنُمْ مَعَ
الإِيمَانِ عَلَى حَبَّتِكَ وَحَبَّبَتِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنْنَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

[আল্লাহমা ইন্নী আসআলুকা বিনু-রি ওয়াজহিকা আন তাগফিরালী ওয়া
লিজামীই আহলি বাযতি ওয়া আহিবা-ই ওয়া-লিওয়া লিদারয়া ওয়ালিল
মু'মিনীলা ওয়ার মু'মিনা-তি মাগফিরাতাল লা তুগাদিরু যামবান ওয়া
তুদবিলানাল জান্নাতা আমী-আন বিগায়রি হিসা-বিন। আল্লাহমা আইনা
জামি-আম মিন হামায়া-তিশ শয়তা-নি ওয়া আমিতনা ওয়া আমিতহুম মা'আলা
ইমানি 'আলা মুহাববাতিকা ওয়া মাহাবাতি নাবিয়িকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুন্নাতিহী বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন]

-হে আল্লাহ! আমি আপনার সক্তাগত নূরের উসিলায় আপনার কাছে
প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ও আমার বংশধর, প্রিয়জন, মাতা-পিতা
এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করে দিন, যার পরে অবশিষ্ট
থাকবেনা কোন গোনাহ ও পাপ-পক্ষিলতা, এবং আমাদের সকলকে বিনা
হিসাবে জান্নাতবাসী করুন। হে আল্লাহ! হে সর্বাধিক করুণাময় সক্তা,
আপনার অশেষ মেহেরবানিতে আমাদেরকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা
করুন এবং আমাদের সকলকে আপনার প্রেম, এবং আপনার নবীর প্রেম
ও সুন্নাতের উপর দৈমানের সাথে মৃত্যুদান করুন।

বিদায়ী দোয়া

الْوَدَاعُ يَا رَسُولَ اللهِ الْفَرَاقُ يَا نَبِيَّ اللهِ الْآمَانُ يَا حَبِيبَ اللهِ! لَا جَعَلَهُ تَعَالَى
آخِرَ الْعَهْدِ لَا مِنْكَ وَلَا مِنْ زِيَارَتِكَ وَلَا مِنْ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَّا مِنْ حَيْزِ وَ
عَافِيَةٍ وَصِحَّةٍ وَسَلَامَةٍ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى جِئْنَكَ وَإِنْ مُتْ فَأَوْدَغْتُ
عِنْدَكَ شَهَادَتِي وَأَمَانَتِي وَعَهْدَتِي وَمِنْتَاقِي مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِيَ
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ.

[আল-ওয়াদা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল-ফিরাকু ইয়া নবীয়াল্লাহ! আল-আমান ইয়া
হাবিবাল্লাহ! লা-জা'আলাহ তাআলা আ-খিরাল আহদি লা-মিনকা ওয়ালা মিন
যিয়ারতিকা ওয়ালা মিনাল ওয়াকুফি বায়না ইয়াদায়কা ইল্লা মিন খায়রিন ওয়া
আ-ফিয়াতিন ওয়া সিহতিন ওয়া সা-লামাতিন। ইন ইশতু ইনশাআল্লাহ
তাআলা জি'তুকা ওয়া ইন মুস্ত ফা আউদা'তু ইনদাকা শাহা-দাতী ওয়া
আমানাতী ওয়া আহদী ওয়া মী-সাক্ষী মিন ইয়াউমিনা হা-যা ইলা ইয়াউমিল
ক্রিয়ামাতি ওয়া হিয়া শাহাদাতু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা-
শরীকালাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসূলুহ। সুবহানা
রবিকা রবিল ইয়েতাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন
ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাবিল আলামীন]

—বিদায় ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হায়রে বিচ্ছেদ হে
আল্লাহর নবী! আল-আমান হে আল্লাহর মাহবূব! না করুন আল্লাহ
তাআলা এটাকে শেষ যিয়ারত-আপনার পবিত্র সত্তার, না আপনার
সাক্ষাতের, না আপনার সম্মুখে হাজির হবার, কিন্তু মঙ্গল, নিরাপত্তা,
সুস্থিতা ও শান্তি সহকারেই। আমি যদি জীবিত থাকি, তবে
ইন্শাআল্লাহ তাআলা, আপনার দরবারে হাফির হবো! আর যদি
মৃত্যুবরণ করি, তবে আমি আমানত রাখছি আপনারই নিকট আমার
সাক্ষ্য, আমার আমানত ও আমার অঙ্গীকারকে আমার জীবনের এ
দিনটা থেকে ক্রিয়ামতের দিন পর্যন্ত। আর তা হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য
যে, নেই কোন মা'বৃদ আল্লাহ ব্যতীত; যিনি একক, তাঁর কোন শরীক
নেই, আর সাক্ষ্য দিছি যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও তাঁর রসূল। পবিত্র ও বহু
উর্দ্দে আপনার প্রতিপালক তা থেকে যা (কাফির) বলছে। আর সালাম
রসূলগণের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের
প্রতিপালক।

pdf By Syed Mostafa Sakib